তিলোত্তমাশিল্প

কুমার রায়

তিলোত্তমাশিল্প

প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন। কলকাতা ৪

প্রকাশক : অরিজিৎ কুমার। প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৪
মুদ্রক : সুভাষ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীভারতী প্রেস, ১১৪ রামমোহন সরণী, কলকতা ৯.
বেলদগর : দীনেশ বিশ্বাস। ১১৯/১ই পাটোয়ারবাগান লেন, কলকতা ৯

শম্ভুদাকে

নাট্যশিল্প এবং সেই সঙ্গে অভিনয়শিল্পের কিছু মূল কথা বুঝতে সুবিধে হবে এই বিবেচনায় গত পঁচিশ বছরে 'বহুরূপী' 'পরিচয়' 'রঙ্গমঞ্চ' 'মাসিক বসুমতী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি এবং কিছু নতুন লেখা নিয়ে এ-বই ছাপানো হল। বিভিন্ন সময়ের লেখা বলে, সম্পাদনা সত্ত্বেও, সতর্ক পাঠকের চোখে হয়তো নানা অসমতা ধরা পড়বে।

বহুদিন আগে স্নেহভাজন শ্রী অতুল সাহা পাণ্ডুলিপি ও পত্রপত্রিকা থেকে পুরনো লেখাগুলি সযত্নে অনুলিপি করে রেখেছিল এবং সে-ই প্রথম প্রকাশনার ব্যাপারে তাগিদ দিতে শুরু করে। তার স্বার্থহীন উৎসাহে আমি মুগ্ধ।

আমাদের নাট্যচর্চা এবং সামগ্রিকভাবে শিল্পচর্চার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র। তাঁর চিন্তা প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ আমাদের নিরন্তর প্রেরণা দিয়েছে এবং কামনা করি আরও বহুকাল দেবে। এ-বই তাকে উৎসর্গ করতে পেরে আমি ধন্য।

তিলোত্তমা শিল্প

শিল্প ও সৌন্দর্য। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য থেকে তিল তিল করে আহরণ করে সৃষ্টি হল তিলোত্তমার। সেই সৃষ্টিপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের নেতৃত্বে সকল দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও উরগেরা ব্রহ্মাকে অনুরোধ করলেন সমস্ত শিল্পের আত্মাকে নিয়ে এক তিলোত্তমা শিল্প রচনার। সে শিল্প-ক্রিয়ায় অধিকার থাকবে সকল শ্রেণীর সুর, অসুর, শূদ্রদের। যা দৃশ্য এবং শ্রাব্য হবে। ব্রহ্মা দায় গ্রহণ করলেন—আহরণ করলেন চার বেদ থেকে পাঠ্য অংশ, গীত অংশ, অভিনয় অংশ এবং রস। কল্পনা করি, সেই আহরণ কাজে সহায়তা করলেন বাগ্‌দেবী, উর্বশী, (বাগ্‌দেবীর পাশে উর্বশীর উল্লেখে প্রমাণ হয়, শিল্পের শ্রীক্ষেত্রে জাতবিচার নেই) কারুশিল্পী বিশ্বকর্মাও আহূত হয়েছেন, বীণা হাতে নারদ মুনিও যেন এসেছেন—আরও একজনকে অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—তার নাম জানি না তবে বৃত্তি জানি, সে দেবরাজের সভার প্রধান রংমশালচি। রচিত হল নাট্যবেদ,—যা পঞ্চম বেদ নামে অভিহিত। - এর পর ইতিহাস।

ভরত মুনির দল একে জনসমক্ষে প্রকাশ করবার এবং নিয়মকানুন রচনার ভার নিলেন। সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হল। নাট্যবেদকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা হল। তার অন্যতম বিভাগ 'নর্তন'। এই নর্তন তিন রকমের—'নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত'। আবার 'নাটক' এই পদটি প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগে যেভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে তাতে নট্‌ ধাতু (অর্থাৎ নৃত্য) বর্তমান, এই নৃত্যের এক মার্গ হচ্ছে—নৃত্য-গীত-বাদ্যের বিজ্ঞান। দেখা গেল নাট্যশিল্প জন্মক্ষণেই নৈকট্য আছে এমন কয়েকটি শিল্পের সত্তার মধ্যে মিলিত হয়ে একটা সুষম অখণ্ড স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করল। এবং শুধু এলিটিস্ট নয়—সকলের জন্যে তা দৃশ্য এবং শ্রাব্য হল। এই 'সকল'কে অবশ্য হতে হবে রসগ্রাহী সংবেদনশীল।

আধুনিক কালে শিল্প বিচার প্রসঙ্গে আমরা শিখেছি যে, সেই শিল্পই মহৎ এবং সুন্দর যে শিল্প একাধিক মিত্রশিল্পের প্রভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। সে হিশেবে নাট্যশিল্প সকল মিত্রশিল্পের সম্মিলিত প্রচেষ্টা হিশেবে মহৎ আখ্যা

পেতে পারে। নাট্যকলার সার্বিক শিল্পগুণের পরিচয় আধুনিক ভাষ্যের অপেক্ষা রাখে না—। নাট্যকলার সমগ্র ব্যঞ্জনা মেনে নিয়েই শাস্ত্রকাররা বলেছেন,

"ন তজ্‌ জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং, ন সা বিদ্যা ন সা কলা—
ন স যোগ ন তৎ কর্ম নাট্যেঽস্মিন্‌ যন্ন দৃশ্যতে।"

এমন জ্ঞান নেই, শিল্প নেই, কৌশল নেই, কর্ম নেই, যা এই নাট্যে দেখা যায় না।

আমাদের আলোচনা এই শিল্পদেহে শিল্প মিলনের। নাট্যশিল্পে মূল হল নাটক—যা দৃশ্যকাব্যের কাব্যাংশ। সাহিত্য। কাব্যগুণ আছে বলেই সাহিত্যের এ বিভাগ শিল্প হয়ে উঠেছে। কালিদাস, ভবভূতি, সফোক্লেস, শেক্সপীয়ার—এঁদের রচিত নাট্যসাহিত্য তাই শিল্প-সুষমায় উদ্ভাসিত। নাট্যশিল্পের সাহিত্যিক ভিত্তি হল নাটক। আধুনিক কালে হাজারো যান্ত্রিক কলাকৌশলে মঞ্চ ধনী হয়ে উঠুক না কেন—কোন শিল্পই শুধুমাত্র যান্ত্রিক অনুপ্রেরণায় সমৃদ্ধ হয় না। কল্পনা এবং স্বচ্ছ দৃষ্টি থাকতেই হবে। না॑াকার সৃষ্টিশীল হলেই তা সম্ভব। আঁকিয়ের মতো দৃষ্টি-প্রাখর্য চাই তাঁর—কবির অন্তর্দৃষ্টি এবং সংগীতশিল্পীর সময়-তাল-জ্ঞান থাকতেই হবে। মূল উপকরণের মধ্যেই যখন এতগুলো শিল্পজ্ঞানের আবশ্যক তখন পুরো শিল্পের রূপারোপের মধ্যে এই শিল্পপ্রসাদগুণ না থাকলে চলবে কেন। নাটক তো শুধু পাঠকের বাসগৃহের নির্জনতায় বিচ্ছিন্ন অনুভূতির মধ্যে বাঁচে না। বাঁচে বহু দর্শকের বহু শিল্পীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। যে নাটকের কোনও চরিত্র পড়তে-পড়তে জীবন্ত লেগেছে পাঠকের—সে চরিত্র অভিনয়ের সময় যদি আরও বেশি জীবন্ত আরও অধিক অর্থবহ করে তুলতে না পারা যায় তবে অভিনয় ব্যর্থ। কী করে আরও অর্থবহ, আরও সজীব করা যায়? নাট্যকার যে অনুভূতির উত্তাপে, কল্পনার ঐশ্বর্যে শিল্পীপদবাচ্য হয়েছেন সেই শিল্পজ্ঞানের অধিকারী হলেই তা সম্ভব। সাহিত্যের সঙ্গে—কাব্যশিল্পের সঙ্গে অভিনয়ে সংশ্লিষ্ট সকল শিল্পীর এই হল সম্পর্ক। অসংস্কৃত মন নিয়ে, অ-কাব্যিক মন নিয়ে, নাট্যকারের চরিত্র কল্পনায় আনা দুরাশা। অনেকে বলবেন নাট্যকার তো কল্পনা করে অনুভূতি দিয়ে একটা চরিত্র এবং তার সংলাপ দিয়েই দিয়েছেন। অধিক করণীয় কী? অধিক করণীয় যে কিছু আছে—যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পীর সাহিত্যজ্ঞান এবং কাব্যজ্ঞান ও কল্পনাশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ধরা যায়—তা প্রমাণও করা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে উদাহরণটা বিদেশ থেকেই নিতে হল। সারা বার্নার্ড ও এলিওনেরা দুজে—দু-জন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী একই নাট্যকারের লেখা একই নাটকে দু-জনে একই ভূমিকায় অভিনয়

করেছিলেন। রাসিনের লেখা নাটকে 'ফেদ্র্' চরিত্রে এঁদের অভিনয় স্বতন্ত্র সৃষ্টির দুর্লভ নজির। বিবরণ থেকে জানা যায়,— সারার আবেগমুখর বাক্‌চাতুর্যে 'ফেদ্র্' যেন জ্বালাময়ী রুদ্রাণীতে পরিণত হত। তা যেমন আরণ্যক তেমনি মহিমময়— তেমনি নির্মম। দুজে-কে দেখলে তৎক্ষণাৎ মনে হত যেন গভীরতম দুঃখের প্রতিমূর্তি। এ দুঃখ প্রত্যাখ্যাত প্রেমের। অভ্রান্ত সাধনার প্রসাদে অভিনেত্রীদ্বয়ের দেহ ও মন একই চরিত্রকে দুভাবে জীবন্ত করে অঘটন ঘটালেন কী করে? কোনটা সত্য, কোনটা অসত্য এ প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। কারণ দর্শক দুটোকেই অসাধারণ সৃষ্টি হিশেবে গ্রহণ করেছিল। এ এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি: এখানেও 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল"—এই সংলাপ গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল মিত্র, দানীবাবু এবং শিশিরকুমার এমনভাবে অভিনয় করতেন যা অনুভূতি-বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর রেখে গেছে। এই কাব্যবোধ, জীবনবোধ যে শুধুমাত্র অভিনেতার প্রয়োজন তা নয় সংশ্লিষ্ট সকল শিল্পীর মধ্যেই আবশ্যক এ শিল্পকে তিলোত্তমা শিল্পরূপে প্রকাশ করবার জন্যে। আবারও উদাহরণের সাহায্যে এ সত্য প্রমাণ করা যায়। বহুদিন আগে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে 'ওমর খৈয়াম' নৃত্যাভিনয় দেখার অভিজ্ঞতা বলছি। এ কাব্যের দর্শন সকলেরই জানা। সবশেষ দৃশ্যে ওমর খৈয়ামের সমাধির ওপর সাকী ওমরের সমস্ত জীবনের সঙ্গী তার পানপাত্রটিকে যখন রাখলেন—তখন মঞ্চের অন্যসব ক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। আলোকশিল্পী সমস্ত মঞ্চের আলো ক্রমশঃ কমাতে-কমাতে কেন্দ্রীভূত একটি আলোকরশ্মি ফেললেন সমাধির ওপর—সেটা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে থাকল। সম্পূর্ণ অন্ধকার মঞ্চে শুধুমাত্র একটি সূক্ষ্ম রশ্মি পানপাত্রটির ওপর নিবদ্ধ হল এবং স্থির হয়ে রইল। যবনিকা। তার পরেও ওই পানপাত্রটি—শুধু ওই পানপাত্রটি আমাদের চোখে অনেকক্ষণ ভাসতে থাকল। বিশেষ কাব্যটির মর্মকথা বোঝবার মতো শিল্পজ্ঞান না থাকলে আলোকশিল্পী আলোর ভেল্‌কি দেখাতে পারতেন হয়তো কিন্তু ওমর খৈয়ামের বক্তব্যটিকে স্পষ্ট করে মনে ধরাতে পারতেন না।

নাট্যকার বাক্‌শিল্পের স্রষ্টা। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে শোনা এবং দেখাটা অনুভূতির দরজায় একই সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে বাক্‌শিল্পের ধ্বনি-ব্যঞ্জনার বিস্তার ঘটাচ্ছে। অভিনেতা সংলাপকে আত্মীকরণ করে পুনঃসৃষ্টি করেন, সেখানে তিনিই বাক্‌শিল্পের ভাবের গভীরতা এবং চিন্তার জটিলতা প্রকাশ করেন— তিনি নিজেই তখন বাক্‌শিল্পী, সেই শিল্পজ্ঞান এই কাজের অপরিহার্য অঙ্গ।

এ তো আর 'জল পড়ে পাতা নড়ে' নয়—জীবনের অভিজ্ঞতা এবং গভীরতা থেকে উৎসারিত সংলাপ। প্রতিটি সংলাপের পিছনে যে উহ্য চিন্তা থাকে—তাকে পূরণ করে নিতে হয়। উপন্যাসে সুবিধে এই যে, ভেতরের চিন্তাটাও কল্পনা করে ঔপন্যাসিক উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করতে পারেন। নাট্যকারের সে সুযোগ নেই—তাই অভিনেতাকে পাদপূরণ করতে হয় দেহের ক্রিয়ায়—একই কল্পনাশক্তির আশ্রয় নিয়ে কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মাধ্যমে। নাট্যাভিনয়ের যে কাব্য, তা যেন নাট্যকার অভিনেতা এবং সংশ্লিষ্ট সকল শিল্পীর সমবায়ে সম্পূর্ণতা লাভ করছে।

যেমন নাটকের ক্ষেত্রে তেমনি নাট্যকলার অন্যান্য বিভাগেও—যেমন সংগীত, নৃত্য ও চিত্রের ক্ষেত্রেও—এ কথা সত্য। সকল শিল্পীই যুক্ত অপর শিল্পের ধর্মটাকে আত্মস্থ করেন, সম্পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যেই। নাটকের জন্ম-লগ্নেই সর্বদেশে সংগীত নৃত্য এবং দৃশ্য সংযুক্ত ছিল। এবং যেহেতু মঞ্চ এবং অভিনেতার মাধ্যমেই নাট্যকলার বিকাশ—সেহেতু মঞ্চশিল্পী ও অভিনয়-শিল্পীও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু এই শিল্পী সংযুক্তির বা তাদের কেবলমাত্র উপস্থিতির আলোচনা নিতান্তই বাহ্যিক। এর আগে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন আসে, প্রাথমিক অবস্থায় এই সমস্ত শিল্পীসমন্বয়ে যে নতুন শিল্প-রূপ সম্ভব হল তা আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছিল কিনা। অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পসত্তা একটা অখণ্ড সত্তা লাভে সক্ষম হয়েছিল কিনা—যাকে স-প্রেমে তিলোত্তমা শিল্প বলা যেত। অবশ্যই ছিল—নইলে তত্ত্বে এর আভাস পাওয়া যেত না। কিন্তু পরবর্তীকালে হয়তো এর সমন্বিতরূপে আদর্শভ্রষ্টতার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। নাট্য-নির্দেশকের আধুনিক আবির্ভাবের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই প্রণতির স্রোতেই ওদেশে আর্ট থিয়েটারের আদর্শ স্থাপিত হল শিল্পী সমবায়ের ভিত্তির ওপর। সুষম জৈব নাট্যরীতির প্রকাশ ঘটল সমস্ত শিল্পরস-সমন্বয়ে। যেন ভর্তৃহরির হারিয়ে যাওয়া সূত্রটা রুশ দেশে 'আর্ট থিয়েটার' প্রসঙ্গে নতুনভাবে উচ্চারিত হল। এবং পশ্চিম দেশে তা অনুসৃত হল: "The Theatre is a craft in which a number of different artists are creatively concerned. For the realisation of a perfect performance, everybody involved must make as full an individual contribution as possible towards an ensemble which, on being realised, must be accepted as greater than the

pride of any of those who have contributed towards it." (John Allen)—এ যেন বকযন্ত্রে পৃথক্ কলাকুশলতাকে কোন এক ঊর্ধ্বপাতনিক প্রক্রিয়ায় পরিশুদ্ধ করে অনির্বচনীয় রস-সমগ্রতার বিকাশ। সে সৃষ্টির মূল্যায়ন সহযোগী শিল্পীসত্তার ঊর্ধ্বে। নাট্যশিল্পের এইটাই সার কথা—এইটাই প্রকাশের সূত্র।

চৌষট্টি কলার প্রত্যেকটির অন্তরে আছে প্রকাশের ব্যগ্রতা। সেই প্রকাশের উপকরণ ও মাধ্যম স্রষ্টার ভিন্নতা অনুযায়ীই বিভিন্ন। চিত্রকর তাঁর রং-তুলি দিয়ে পটের ওপর রক্তিম সন্ধ্যার এক অপরূপ মুহূর্ত ধরে রাখলেন, সুরশিল্পী সেই একই সন্ধ্যাকে অনুবাদ করলেন পূরবীর মূর্ছনায়. আশ্চর্য হব না নৃত্যশিল্পীও হয়তো সেই সন্ধ্যার' মুড্'কে কোন বিলম্বিত লয়ের লীলায়িত দেহভঙ্গিমায় ছন্দে বাঁধবেন। বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন শিল্পের প্রকাশ ঘটে—জীবন ও প্রকৃতিকে আপন শিল্পপ্রকাশমাধ্যমে কখনও অনুবাদ কখনও ভাবানুবাদ করে। নাট্যকলাও অপেক্ষা রাখে প্রকাশের। কিন্তু তার মাধ্যম এই সমস্ত শিল্পমাধ্যম থেকে স্বতন্ত্র। এবং যেহেতু এ শিল্পের সার ভাগের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে আছে গতিময়, সমৃদ্ধিময় নব-নব শিল্পরূপ—সেইহেতুই অতি সরলীকৃত উত্তরে এর প্রকাশ সম্ভব নয়। 'হ্যামলেট' নাটকে যেখানে রাত্রি অবসানে দুর্গপ্রাকারের ওপর যুবরাজের মুখে ভোরের বর্ণনা আছে - সেই বর্ণনা শিল্পবিচারে অতুলনীয়, শেক্সপীয়ারের কবিকৃতি সেখানে অনুপম। সেই নাটক অভিনয় কালে রাত্রির অন্ধকার কাটিয়ে ওই আবৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গে যদি আলোকশিল্পী অনেক লাল, সবুজ, হলদে 'জিলেটিন' কাগজ বা 'সেলোফেন্' কাগজ ব্যবহার করে ভোরের সূর্যোদয় বোঝাতেন (বিচ্ছিন্নভাবে হয়তো সেইটাই ভোর প্রকাশক আলো হতে পারত) তাহলে কাব্য উপেক্ষিত হত নিশ্চিত; পক্ষান্তরে আলোকশিল্পী যদি দুর্গের পাথরে কাটা প্রাচীরে বা দেওয়ালে কোনও একপাশ থেকে ভোরের মুদ্রা-ব্যঞ্জক কোনও আলোর ব্যবহার করেন তবে ওই আবৃত্তিকে তথা নাটকের কাব্যমুহূর্তকে আরও গভীর করে প্রকাশ করতে সাহায্য করত। নাটকে আলোকশিল্পী হতেন সার্থক।

প্রেক্ষা এবং রঙ্গ এই নিয়ে রঙ্গালয়। প্রেক্ষাসীনদের কথা ভেবে, অর্থাৎ দর্শক ভোক্তাদের কথা ভেবে রঙ্গকে মঞ্চোপরি স্থাপনা করে একপ্রান্তে অপসারিত করতে হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে, মধ্যযুগীয় রোমে, এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডে এবং আধুনিক কালে সকল দেশেই রঙ্গ মঞ্চের ওপর স্থাপিত। নাট্যশিল্পের প্রকাশ-

মাধ্যম এই মঞ্চোপরি রঙ্গ এবং সর্বোপরি তার অভিনেতা। অভিনেতার উপকরণ বিশিষ্ট কতকগুলি শিল্পধর্ম — যেমন সংলাপ বাক্‌শিল্পের ধর্ম, সংগীত ও ভঙ্গিতে সুর ও ছন্দ, চরিত্রচিত্রণে তার উপকরণ অবশ্য তার নিজের দেহ, কণ্ঠস্বর, অভিব্যক্তি তার সত্তা। তেমনি মঞ্চের আলোতে দৃশ্যে চিত্রশিল্পের ধর্ম। এই সমস্ত ধর্মগুলির প্রকাশ রঙ্গ ও অভিনেতার মাধ্যমে।

মঞ্চকে নিয়েই শুরু করা যাক। আমরা থিয়েটার দেখি এবং যাত্রা শুনি। অবশ্য এমন কথা নিশ্চয়ই নয় যে, দুটো ক্ষেত্রে অপর দুটি ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় থাকে। যাই হোক্, থিয়েটারে দেখার কাজটা প্রাধান্য পেয়েছে বলেই মঞ্চকে প্রসেনিয়াম ফ্রেমের মধ্যে বিবর্তিত হতে হয়েছে। এই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের শুরুতেই দর্শকদের তরফ থেকে মঞ্চ-চিত্র ফ্রেমের মধ্যে বাঁধা। বস্তুত সেই থেকেই চিত্রধর্মিতা মঞ্চে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পরিদৃশ্যমান্ মঞ্চ এই ফ্রেমের অন্তর্গত এবং মঞ্চে আলোর ব্যবহার সেই থেকে মঞ্চবস্তু ও অভিনেতাকে শুধুমাত্র আলোকিত করার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বিশেষ চরিত্রের 'মুড্' এবং আলোছায়ায় 'মডেলিং' শুরু করতে যত্নবান্ হল — আর তখনই সেটা হয়ে উঠল শিল্প। ভাবুন-না, গভীর অরণ্যের এক দৃশ্য, নির্জন দুপুর। এক ডাকাত স্টেজের সামনের দিকে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে আয়েসে। সমস্ত মঞ্চে শুধু গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বনপথে যেমন আলোর টুকরো ছড়িয়ে পড়ে শুধু সেই আলোর টুকরোগুলোই আছে — এবং সেই টুকরো-টুকরো আলো ফেলা হয়েছে একটা পরিবেশ রচনার উদ্দেশ্যে। এমন সময় এক মেয়ে কলসী কাঁখে পিছন থেকে এগিয়ে আসে। যতই সে আসছে তার মুখে, আভরণে, কলসীতে কখনো সেই আলোর টুকরো কখনওঅন্ধকার। দর্শকরা সংশয়ে দুলছে — কখন কী হয়। এই সংশয়-শঙ্কাটা প্রকাশ করতে সাহায্য করছে ওই আলোছায়া। আলোর সাহায্যে এমনি ফল আমরা পেয়েছি 'রক্তকরবী'তে, — 'চার অধ্যায়ে'; আঁকা ছবিতে শিল্পী তাঁর বিষয়বস্তুর 'ডায়মেন্‌শন্' আনেন আলোছায়ার খেলায় — রং ও ছায়া দিয়ে। প্রকৃতি-দত্ত 'ডায়মেন্‌শনের অধিকারী মানুষ। আলোর সাহায্যে সেই মানুষকে মডেলিং না করে সামনে থেকে একরাশ আলো ফেলে 'ডায়মেন্‌শন্' কমিয়ে দেওয়ার মানে শুধু দেখান, শিল্প নয়।

শিল্পীর আঁকা ছবি পুরোটাই একটা 'ডিজাইন'। প্রকাশরীতি এবং ছন্দ — এই দুটো জিনিশ 'হারমনাইজড্' হয় একটা ছন্দায়িত বুননে। এই ফল যখন আমরা মঞ্চের ফ্রেমের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি, তখন তা শুধুমাত্র আমাদের দুটো

ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে তাই নয়, — আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে, শিল্পবোধকে, — একটা নান্দনিক পরমমূল্যে উত্তরণ ঘটায়।

সমস্ত শিল্পের প্রকাশরীতির মূলে আছে প্রকৃতি, মানুষ ও বস্তু এবং এই তিনের মধ্যেকার সুরের ঐক্য। ছবির রঙে, রেখায়, বস্তু-সংস্থাপনে সেই সুরের ঐক্যটাই লক্ষ্য। এরই প্রয়োজনে কম্পোজিশন বা বিন্যাস। আঁকা ছবিতে সুবিধে এই যে, সেখানে একটি মুহূর্ত ধরা হয় শুধু। মঞ্চের ফ্রেম-মধ্যস্থিত ছবি একটি মুহূর্তের স্থির চিত্র নয়। নাটকের প্রধান উপজীব্য ঘটনা এবং কতকগুলি ক্ষণ ও মহাক্ষণের (সিচুয়েশন্ ও ক্রাইসিস্) মধ্য দিয়ে তার পরিণতি। ঘটনাপ্রবাহে নিয়ত সঞ্চরণশীল অভিনেতা এবং পরিপ্রেক্ষিতের কম্পোজিশন প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন-শীল। তাই এক্ষেত্রে কাজটা দুরূহ। তবে চিত্রশিল্পের ধর্মই এর মৌল প্রেরণা। সমস্ত কম্পোজিশনে একটা উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যটাই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটা 'ডিজাইন'। সেই উদ্দেশ্য প্রকাশেই রঙের ব্যবহার, সরল-রেখা, বক্ররেখা, বৃত্ত, কতরকম রেখার ব্যবহার ছবিতে। আঁকিয়েদের কাছে এ কথাটা অজানা নয় যে, সহজ বঙ্কিম রেখা লীলায়িত ভঙ্গিকে প্রকাশ করে; শান্তি ও স্বস্তির দ্যোতক সমান্তরাল রেখা; লম্বরেখা আদর্শবাদ, দম্ভ এবং তির্যক-রেখা শক্তি ও গতিকে প্রকাশ করে। কম্পোজিশনে রেখার প্রাধান্য 'মুড্' প্রকাশের সহায়ক এবং উদ্দেশ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে টেনে নিয়ে যাওয়াও রেখার অপর এক কাজ। নাটকের দৃশ্যের উদ্দেশ্য তার ভাবকে প্রকাশ করা। সেই ভাবকে প্রকাশ করতেই মঞ্চে পরিপ্রেক্ষিত রচনা, — পটের রং নির্বাচন, মঞ্চ-সজ্জার রেখা, অভিনেতার ভঙ্গির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য ঘটাতে হয়। বস্তুত নাটকের একটি দৃশ্য অনেকগুলি আঁকা ছবির বিন্যাস সৌকর্যের সৃষ্টি - যা স্বভাব অনুসারী এবং বাহুল্য বর্জিত।

ধরা যাক 'চার অধ্যায়ে'র শেষ দৃশ্য — এলার বাড়ির ছাদ, রাত দুপুর। পিছনে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মঞ্চের এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্যন্ত সরলরেখায় ছাদের প্রাচীর; তারই মাঝ বরাবর একটা পারস্পেক্‌টিভে তৈরি দূরের বাড়ির অস্তিত্ব — যার জানালায় দৃশ্য চলাকালীন একসময় বাতি নিভে যায়। আর সামনে অভিনেতার বাঁদিকে একটা ক্যাক্‌টাস্ গাছ টবে এমন জায়গায় রাখা, যাতে মঞ্চের স্বল্পরেখা এবং আলোর রেখা ওই বস্তুটির দিকে আমাদের দৃষ্টিকে নিয়ে যায়। সমস্ত মঞ্চ ফাঁকা, কোনও বাহুল্য নেই — তবু অত বড় মঞ্চটা কোনও সময়ে ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে না। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হয়েছে ওই নিরাভরণতার

মধ্যে দিয়েই। নিস্তব্ধ রাত্রি এবং একটা মৃত্যুর সংকেত। ওই ক্যাক্‌টাস্ যেন তারই প্রতীক। দৃশ্য বিন্যাসের উদ্দেশ্য ওতেই সফল। 'চার অধ্যায়ে'র পরিণতিকে ইঙ্গিতময় অর্থবহ করে তুলতে সাহায্য করছে। ওই ক্যাক্‌টাসের পাশে বসে অন্তু ওপরে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে—এলা দাঁড়িয়ে অঞ্জলি ভরে ফুল ঢেলে দিচ্ছে, তখন বিন্যাসের সৌকর্যে সে অপরূপ এক ভাস্কর্য। কিন্তু মঞ্চের প্রতিবন্ধক হল—মঞ্চসজ্জা দৃশ্যারম্ভে একবারই সম্ভব। কাজেই তার রেখা এবং কম্পোজিশনের পরিপ্রেক্ষিত মোটামুটি ভাবে স্থির। অথচ একই দৃশ্যে অনেকগুলি মুহূর্ত তৈরি করতে হবে যা ছবির মতো, অনেকগুলি ভাবের প্রকাশ ঘটাতে হবে। সেজন্য মঞ্চে রেখা অঙ্কন—বস্তু সংস্থাপন, পটের রং, বস্তুর রং ইত্যাদি দৃশ্যের মূল সুরটাকে বজায় রেখেই করতে হয় এবং বাকী দায়টা অভিনেতার। সময় বিশেষে আলোর সাহায্যে নতুন রেখা তৈরি করে নিয়ে উদ্দেশ্যানুগ করে নিতে হয়। যেমন 'রক্তকরবী'তে প্রথম অংশে বিশু-নন্দিনীর কথা বলার সময় করা হয়। যক্ষপুরীর শক্তিমদমত্ততা দম্ভ প্রকাশক লম্বরেখার থাম, রাজার দরজার সামনে জালের জটিলতা—আলো-আঁধারিতে অস্পষ্ট করে তোলা হয়। অর্থাৎ ওই লাইনগুলো তখন ভাঙা হল। নইলে ওর মধ্যে এদের জীবনের গভীর কথায় অত আত্মীয়তা আনা যেত না।

একটা সুন্দর ছবির মধ্যে আমরা নাটকের আভাস পাই। একটা ছন্দ পাই—পাই সংগীত। তেমনি ভাল গানের মধ্যেও পাওয়া যায় চিত্রধর্ম, নাটকের ইঙ্গিতও প্রকাশ পায়। মঞ্চে উপরি সুবিধে হল তার 'ডায়মেন্‌শনে'র ব্যাপকতা, বাক্‌শিল্পীর সংলাপ, গান, সঞ্চরণশীল অভিনেতা—তবু কেন সুর ছন্দের প্রকাশ ঘটবে না নাটকে! শুধুমাত্র প্রয়োজনে কণ্ঠ-সংগীত বা নাচ থাকলেই এ প্রকাশ সার্থক নয়। সুর ও ছন্দ তো আমাদের স্বভাবের মধ্যেই আছে। আর নাটকে তো আমাদের প্রয়াস সেই স্বাভাবিকতার প্রতিষ্ঠা। অতিনাটকীয় করে অস্বাভাবিক সুরও নয়—অস্বাভাবিক ভঙ্গিও নয়—বা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে গান নাচ সংযোজনও নয়। স্বাভাবিক সহজ করার মধ্যেই আছে সুর, গতিভঙ্গির মধ্যে আছে ছন্দ। অস্তিত্বের মূল ভূমিতেই এই সুর ও ছন্দ। সুর ও ছন্দ কোথায় নেই। ছেলে কাঁদে সে-ও তো একটা সুর, পাখি ডেকে ওঠে—সেখানে সুর, আমরা রাগ করে কথা বললেও বিভিন্ন পর্দায় কণ্ঠস্বর ওঠানামা করে একটা সুরেই স্থাপিত হয় তা, কলসীকাঁখে পুকুরঘাটে যে মেয়ে তার চলনে ছন্দ—অমন যে গাধা তার গর্দভ রাগিণীও বৃথা নয়—সে সুরও নাকি 'রেখাব'। স্বভাবকে

ভুলে অ-স্বভাবের আবির্ভাব ঘটালেই সুর ও ছন্দের মৃত্যু ঘটে। আর তারই জন্য অনুশীলন—স্বাভাবিকে ফিরে যাবার অনুশীলন। সংগীতশিল্পী গলা সেধে প্রস্তুত বলেই কণ্ঠের সুর ও কথা দিয়ে গানের ভাবটিকে প্রকাশ করেন। সামান্যতম স্বরের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে অসাধ্য সাধন করেন। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে হয়, কথা নেই, তবু শুধুমাত্র ভঙ্গি দিয়ে নৃত্যশিল্পী তাঁর ভাবকে প্রকাশ করেন। চকিত চাহনি, ভ্রূভঙ্গি, আঙুলের সামান্য একটি মুদ্রা, গতিভঙ্গি দিয়ে নাচের যথার্থ 'মুড্'কে দর্শকদের সামনে স্পষ্ট করে তোলেন। অভিনয়ের আসল কথা প্রকাশ করা, ব্যক্ত করা এবং সে প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম অভিনেতা। তার কণ্ঠ ও দেহকে আশ্রয় করে সে কাজ করতে হয়। অসংস্কৃত, অমার্জিত কণ্ঠস্বরে এবং ভঙ্গিতে আমরা সাংসারিক জীবনে চালিয়ে দিতে পারি একরকম। সেখানে সম্পর্কটা একসঙ্গে অল্প লোকের সঙ্গে এবং যা কিছু প্রকাশ করি তার সাদামাটা অর্থটা বোঝাতে পারলেই যথেষ্ট। কিন্তু অভিনয়টা শিল্প এবং দায়টা হল থিয়েটার-ভর্তি দর্শকদের কাছে। এর প্রকাশও গভীর এবং জটিল। অভিজ্ঞতা থেকে একটা উদাহরণ দিই। অভিনয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা পরীক্ষা হচ্ছিল—'চার অধ্যায়ে'র অন্তর একটা সংলাপ অংশ। সংলাপটা এই:

"চার বছরের কিছু কম হবে, স্টিমারে খেয়া পার হচ্ছি মোকামার ঘাটে। তখনও আঁকড়ে ছিলুম পৈত্রিক সম্পত্তির ভাঙা কিনারটাকে, সেটা ছিল দেনার গর্তে ভরা। তখনও দেহে মনে সৌখিনতার রঙ লেগে ছিল, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবীটি, মুগার চাদর কাঁধে, একলা বসে আছি ফার্স্ট ক্লাস ডেক্-এ বেতের কেদারায়। তুমি জনসাধারণের দলে, কোমর বেঁধে ডেক্-প্যাসেঞ্জার, চেষ্টাকৃত অসংকোচের ভান করে বললে আপনি খদ্দর পরেন না কেন?—আজও দেখতে পাচ্ছি তোমার সেই ব্রাউন রঙের শাড়ি - মনে আছে।"

এই লাইনগুলোর মধ্যে যে ছবি ফুটে ওঠে—যে আবেগ প্রকাশ পায় তা কারো গলায় স্পষ্ট হল না। অনেকেই খুব স্বাভাবিক করেই বলার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু নিষ্ফল হল। যে গলা বেরুলো তার না ছিল ধার—না কারুকার্য। খুব ভাল বললেন যাঁরা তাঁদের গলা মঞ্চের প্রথম সারি থেকেও শোনা যেত না। অথচ বাইরে থেকে যাঁরাই বহুরূপীর 'চার অধ্যায়' দেখেছেন—তাঁরাই জানেন এই লাইনগুলোর মধ্যে ছবি এবং আবেগটা কত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা পারলাম না কেন? ও লাইনগুলোর মানে এবং ছবিটা কি মনের মধ্যে স্পষ্ট ছিল না? —সকলের না থাকলেও অনেকেরই ছিল—কিন্তু প্রকাশযন্ত্র অর্থাৎ কণ্ঠস্বর তৈরি ছিল না, যা ভাবকে বহন করে চিত্ররূপ প্রকাশ করতে সক্ষম। নিজস্ব পর্দাটা ঠিক থাকলে তবেই বিভিন্ন পর্দা ছুঁয়ে স্বরান্তর ঘটান সম্ভব। সুরের

পরেই আসে ছন্দের কথা। নাচের সঙ্গে, ছবির রেখার সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক। আগেই বলা হয়েছে আসল কথা 'মুড্' প্রকাশ করা। নাচের মতো অভিনয়ের হাঁটা, চলা, ফেরা, ওঠা, বসা, দাঁড়ানো, সবটাই ভাব প্রকাশক হবে না কেন? পিছনের চিন্তাটা প্রকাশ করা যাবে না কেন—যা ছবির রেখায় সম্ভব? সেই বিখ্যাত ছবিটার কথা স্মরণ করুন যেখানে সুজাতা বুদ্ধকে পরমান্ন নিবেদন করে প্রণাম করে। প্রণাম করার যে ভঙ্গি—যে ছন্দ রেখায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাতে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের, সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার মনটা ফুটে ওঠে। নাটকের মধ্যে ওইরকম এক মেয়ে যদি কাউকে প্রণাম করে আর তার প্রণামের ঘটা দেখে যদি কিছুই মনে না হয়, 'মুড্'টা প্রকাশ না পায়, তাহলে কি ফল ভাল হয়! অথচ কোন্ শিক্ষা থেকে এ জ্ঞান আসবে?—ছন্দজ্ঞান থেকেই তো। এমনি অনেক নির্বাক মুহূর্ত নাটকে থাকতে পারে যা পরিমিত ছন্দের জ্ঞান দিয়ে পূরণ করতে হয়। একটা চরিত্র মঞ্চে হেঁটে আসছে—তার ভাবনার 'মুড্'টা কী তা যদি হাঁটা দেখে বোঝা যায় তবে সেটা অতিরিক্ত ফল লাভ নয়? আমরা কথা বলি আমাদের নিজস্ব স্বরগ্রামে,—পর্দাটা সেই সুরে বাঁধা। সেই পর্দাটা আমাকে জানতে হবে—যেমন গাইয়েরা জেনে নেয়। জানা থাকলে তবেই তো স্বরান্তর ঘটিয়ে ভাবান্তর ঘটাতে পারব। অর্থাৎ কথা বললেই আমরা গান করব না কিন্তু গানের ধর্ম বর্তমান থাকবে। তেমনি চলতে-ফিরতে ধিনাক-না-তিন্-তিন্না করেও নাচব না—কিন্তু নাচের ধর্মটা প্রকাশ পাবে। আমাদের কথা বলা, চলাফেরার মধ্যে,—মঞ্চে সন্নিবেশিত সমস্ত বস্তুর মধ্যে তাল এবং লয় থাকবে, থাকবে সুর এবং ছন্দ। কোনটাই বেতালা, বে-আন্দাজ নয়, সমস্তটাই ফ্রেমের ছবিটাকে সুন্দর করে নাটকের মূল সুরটাকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই। আলোচনাটা ক্রমশই মঞ্চের ব্যাপ্তি থেকে অভিনেতার ওপর কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। বস্তুতপক্ষে নাট্যশিল্পের প্রধান উপকরণ যে অভিনয়শিল্পী। এ সমস্ত শিল্পগুণের প্রকাশ অভিনেতার মাধ্যমেও ঘটবে। আধুনিক অভিনয়বিজ্ঞানের অন্যতম প্রবক্তা স্তানিস্লাভস্কি তাই বলেছেন, "নাট্যশিল্পের সত্যকে বুঝতে গেলে শব্দ, সংগীত, এবং ছন্দের জগৎ থেকে আহরণ করতে হবে অনেক কিছু '...how important it is for us to have in as many beautiful and strong impressions as we can.' শিল্পীকে চোখ খুলে দেখতে হবে—শুধু দেখলেই চলবে না—কী করে দেখতে হবে, তাও জানতে হবে। সে কী দেখবে? না, নিজ শিল্পক্ষেত্রের, অপর শিল্পের এবং জীবনের মধ্যে যা কিছু সুন্দর।" সমস্ত

শিল্পীর ক্ষেত্রেই এটা সত্য। শিল্পের মূল লক্ষ্যই হল এটা। অভিনেতার পক্ষে যেমন, তেমনি সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই এটা প্রয়োজন—বিশেষ করে নাট্যশিল্পের আর-একজন শিল্পীর পক্ষে তো বটেই। তিনি পরিচালক। সমস্ত অনুষ্ঠানকে সুচারু সুসঙ্গত করার দায়িত্ব তো তাঁরই—এ ব্যাপারে পরিচালকের শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক বিচরণের দাবী অনস্বীকার্য।

এই কারণেই বোধহয় অনেকে নাট্যশালাকে মন্দির, প্রত্নশালা, পাঠগৃহ বলেছেন। এটা আমাদের গর্বের কারণ নিঃসন্দেহে—কিন্তু তফাৎটাও বলা প্রয়োজন। চিত্র বা প্রত্নশালায় কোন অভিসন্ধিৎসু ছাত্র ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই ভাস্কর্যের অপরূপ ভঙ্গি—একই চিত্রের সুষমা, বর্ণাঢ্যতা, বিন্যাসের সৌকর্য অনুশীলন করবার সুযোগ পান। পাঠাগারে কোন বিশেষ বিষয়ের কিংবা কোন বাক্‌শিল্পীর প্রকাশধর্মের এবং রীতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান দিনের পর দিন। কিন্তু নাট্যশালায় নগদ বিদায়ের কারবার। দায়সারা কাজের এবং ভেজালের সুযোগও বুঝি সেই কারণেই। অপর পক্ষে থিয়েটারকে যাঁরা 'আর্ট থিয়েটার' করে তুলতে চান—যে 'আর্ট' জীবনের, মানুষের জন্যে উৎসর্জিত—তাঁদের দায়িত্বও বুঝি সেই কারণেই সর্বাধিক। মুহূর্তের হলেও দেখার ব্যাপারটা শুধু চোখের মধ্যেই নিবদ্ধ না থাকে—বা তাৎক্ষণিক উত্তেজনাতেই না পর্যবসিত হয়। প্রতিমুহূর্তের শিল্পসুষমা যেন ভাবের অভিজ্ঞতায় পৌঁছয়—মহত্তর জীবনের আকাঙ্ক্ষা যেন জাগিয়ে তোলে। শিল্পী ও দর্শকের দায়িত্বও এ ক্ষেত্রে কম নয়। থিয়েটারকে বিভিন্ন শিল্পীর, কুশলী শিল্পীর প্রদর্শনীঘর জ্ঞানে বিবেচনা করলে স্বতন্ত্র শিল্পের মৃত্যু ঘটে এবং দর্শক-সাধারণও সেই জ্ঞানে রঙ্গালয়ে এলে মৃত্যুর পর সমাধি রচনার কাজটাই করবেন। তিলোত্তমা সৌন্দর্যের কোন উপভোক্তা আহরিত সৌন্দর্যের বিভিন্ন উপকরণগুলি দেখতে চেয়েছিলেন কিনা জানা নেই—কিন্তু আজকের দিনে কোন অবুঝ রসিক থিয়েটারে এসে সংশ্লিষ্ট শিল্পলক্ষণগুলি যদি আলাদা-আলাদা করে দেখতে চান,—তবে তাঁকে বলা ছাড়া উপায় নেই,—এ তিলোত্তমা শিল্পের সত্য বিচ্ছিন্নতায় নয়। এ শিল্প সত্য, অধিকতর বাস্তবিক, কারণ তা অধিকতর মানবিক। এবং বাস্তবিকতা এবং মানবিকতার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার স্থান নেই।

স্রষ্টা / শিল্প / প্রকাশ / সত্য

এক নৈয়ায়িক এবং নন্দনতাত্ত্বিক তর্ক তুললেন অভিনেতারা শিল্পী নন, — স্রষ্টাও নন। সৃষ্টি হচ্ছে উপভোক্তার মনে। অর্থাৎ যে দর্শক দেখছে তার মনেই সৃষ্টি হচ্ছে। এবং তাঁর যুক্তিতে এবং কূট তর্কে আমরা যাঁদের শিল্পী বলি, স্রষ্টা বলি তাঁরা কেউই নাকি সৃষ্টি করছেন না। শেষ পর্যন্ত তর্কটা একটা নিষ্ফলা জায়গায় গিয়ে ঠেকল — এবং 'তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল' এই জায়গায় এসে থামল। থামাতে হল, কেননা তাঁর আলোচনার ভিত্তিভূমি এবং প্রেমিস্‌টাই আলাদা। এবং সেখানে প্লেটোর মত থেকে শুরু করে ক্রোচের মতে এসে পুঁথি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অগ্রগামী ভাবনার অবকাশ নেই। কেবল এতদিনের একটা লালিত বিশ্বাসে ধাক্কা দিয়ে গেল।

তাহলে অভিনেতা কী? সে কি কেবল কাহিনীর ইলাস্ট্রেশন্! তার কাজ কি গল্পটাকে কতকগুলি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া? এই কাজ করবার জন্যই কি গিরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার অভিনয় করে গেছেন; শম্ভু মিত্র অভিনয় করেছেন? বিদেশে বহু যুগে, বহু অভিনয়শিল্পী নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তাঁরা তো এক থেকে বহু হয়েছেন। সেই এক থেকে বহু হয়ে নতুন রূপে নিজেদের প্রকাশ করেছেন যা আগে কখনো হয়নি _ যা নাটকের চরিত্রটা পড়ে বোঝা যায়নি — হাজারবার পড়েও না। তাঁরা দেহ দিয়ে, কণ্ঠস্বর দিয়ে, অভিব্যক্তি দিয়ে — মন দিয়ে, চিন্তা দিয়ে একটা কিছু তৈরি করছেন যা 'অভূতপূর্ব' এবং যা দেখে অপরের মনে রস সঞ্চার করছে। উপভোক্তাকে ভাবাচ্ছে — আবেশে আপ্লুত করছে। এবং এক অনাস্বাদিত লোকে উত্তীর্ণ করছে। তাহলে তাকে স্রষ্টা বলতে আপত্তি কি? ওই কূট তর্কটাকে যদি ভুলে যাই তাহলে আপত্তি করবার কিছু থাকে না। কেননা তর্কের বাইরেও আরও কিছু ঘটে — সেই ঘটনাটাই সত্য। একজন ভাস্কর বা চিত্র-শিল্পী প্রাণহীন উপকরণ দিয়ে তাঁদের মনোগত বাসনাকে, কল্পনাকে, আদর্শকে রূপ দিতে পারেন এবং সেই শিল্পমাধ্যমে দর্শকের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তি-স্বরূপের পরিচয় ঘটে। এবং যে যাই বলুক অভিনয়শিল্পই নাট্যক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ।

পাদপ্রদীপের প্রভামণ্ডলের ভেতরে এবং বাইরের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র হল অভিনেতা। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমেই তো যোগস্থাপন করেন। অভিনয়শিল্পে নটের ব্যক্তিস্বরূপই নাটককে সঞ্চরণশীল করে তোলে—কারণ সে ব্যক্তিস্বরূপের সারতত্ত্ব হচ্ছে স্বাতন্ত্র্য এবং প্রয়োজনমতো বিস্তার ও সংকোচনেই অনন্ত ক্ষমতা। নট তার অন্তরের সমবেদনাকে অঙ্গলীলায় প্রতিমূর্ত করে দর্শককে বিচলিত ও বিগলিত করে।

প্রত্যেক শিল্পের এবং সৃষ্টির কতকগুলো উপকরণ থাকে। সেই উপকরণ নিয়েই শিল্পী কাজ করেন এবং কিছু সৃষ্টি করেন। যেটা উপকরণচিহ্ন বিলুপ্ত করে নতুন কিছু। অভিনেতার উপকরণ তাঁর নিজের দেহ, কণ্ঠস্বর আর নাট্যকারের লেখা, নাটক, চরিত্র, পরিচালকের নির্দেশ ইত্যাদি। যদি অভিনেতা সৎ শিল্পী হন তবে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সচেতনতা এবং বোধকে নিয়োজিত করে একটা চরিত্র সৃষ্টি করবেন। এবং তখনই এক অভিনেতা থেকে অন্য অভিনেতার পার্থক্য দেখা দেয়। পার্থক্য ওই বোধের তারতম্যের ফলেই। অভিনয় শিল্প বলেই এর একজন রূপকার দরকার—সেই রূপকার অভিনেতা। নাটকে নট-দর্শক সংবাদ ব্যতিরেকে থিয়েটারের সমস্ত উপকরণ কেবল উপকরণই থেকে যায়। যে রহস্যময় সৃষ্টিপ্রবাহ দর্শক-অভিনেতাকে সংযুক্ত করে দেয় সেটা কী করে তৈরি হচ্ছে?—নাট্যকারের দেওয়া সংলাপ ও পরিচালকের ব্যাখ্যা এ সবকে ছাপিয়ে অভি-নেতার ব্যক্তিত্বের, অভিজ্ঞতার, কল্পনার ছোঁয়ায় একটা তৃতীয় গুণের উদ্ভব ঘটে অভিনেতার অভিনয়ের মধ্যে। সেটাই অভিনেতার নিজস্ব সৃষ্টি এবং সেটা শিল্প। এরই আকর্ষণে শিল্পী আসেন অভিনয় করতে—নিজেকে মুক্ত করতে—প্রকাশ করতে।

আবারও সেই নৈয়ায়িকের কথাটা মনে আসছে। তিনি বললেন, প্রকৃতি সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে। যে সেই সৌন্দর্য দেখছে সে তার আপন মনের মাধুরী দিয়ে তখন সৃষ্টি করছে মনে। সে যদি কবি হয় তো সেই মনের সৃষ্টিটাকে ভাষায় প্রকাশ করছে মাত্র। যদি সে চিত্রশিল্পী হয়—তবে প্রকৃতির সেই লীলায় যখন মুগ্ধ হচ্ছে তখন তার মনে সৃষ্টি হচ্ছে। তারপর সে কেবল রঙে, রেখায় তা প্রকাশ করে। নাট্যকারও তাই। তাঁর কথায় আবার সেই প্লেটোর কথা মনে হল—শিল্প অনুকরণকারীর অনুকৃতি মাত্র। যদি ওঁদের মতটা জেনে নেওয়া হয়—তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে তাঁরা সৃষ্টির প্রকাশটাকে সৃষ্টি বলতে আপত্তি করছেন! ব্যাপারটা একটু তর্কের জন্যে তর্ক হয়ে দাঁড়ায় না কি? শিল্পী তো নিজেকে

লুকিয়ে রাখতে পারেন না - তিনি প্রকাশ করবেন। প্রকৃতি একটি সুন্দর ফুল ফুটিয়েছেন ; হতে পারে তাঁর সৃষ্টি সেই ফুলের কোরকের অন্তরালে কোন এক মুহূর্তে ঘটেছে। কিন্তু যখন সে ফুল রঙে, সৌরভে বিকশিত তখনই — হ্যাঁ, কেবল তখনই আমি সে সৃষ্টিমাহাত্ম্য উপলব্ধি করছি। এবং প্রকৃতির সৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন হচ্ছি। আমি কিন্তু ওই ফুলটিকেই প্রকৃতির সৃষ্টি বলছি। এই বলাটা কি মিথ্যে ?

নাট্যকার কাহিনী গড়লেন, চরিত্র আঁকলেন, সংলাপ লিখলেন। এগুলো অবশ্যই তাঁর কল্পনার সৃষ্টি। এবং তিনি স্রষ্টা। সেইটাই যদি নাট্যকলার শেষ সৃষ্টি হত তাহলে নাটক পাঠ করলেই সব রস আস্বাদিত হয়ে যেত। কিন্তু সেই নাটক অভিনয় করে অভিনেতা যে আরও অধিক রস সৃষ্টি করেন — সে রসের আস্বাদও স্বতন্ত্র। তা যদি না হয় তবে বুঝতে হবে অভিনেতা শিল্পী নন, কেবল-মাত্র নাট্যকারের কাহিনীর ভারবাহী মুটে মাত্র। যেটাকে আগে বলা হয়েছে 'ইলাস্ট্রেশন্'। মহৎ শিল্পীরা কেবলমাত্র ইলাস্ট্রেশন্ বা মুটে নন — এমন দৃষ্টান্ত যে অনেক আছে। তাঁদের কল্পনায়, ভাবনায়, নৈপুণ্যে যে অনেক নাটকের অনেক চরিত্র সৃষ্টি হয়ে দেখা দিয়েছে। স্বাদে, বর্ণে, গভীরতায় অনন্য তার প্রকাশ। এইসব ব্যক্তিস্বরূপের আবেগপ্রবাহ দর্শকদের কল্পনার দ্বারে গিয়ে ঘা দেয় এবং তখনই অভিনয় নিকষপাথরে ঘষে সোনা হয়ে যায়। একটা নাটকের একই চরিত্র দুই ভিন্ন শিল্পীর সৃষ্টিচাতুর্যে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে দর্শকদের আস্বাদনের বৈচিত্র্য ঘটায়। মুটে বা ইলাস্ট্রেশন্ হলে সেটা সম্ভব হত না। তাই যখন সারা বার্নার্ড ও এলিওনেরা ডুজের অভিনয়-বিবরণ শুনি তখন অবাক বিস্ময়ে এই শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধায় আনত হতে হয়। রাসিনের শ্রেষ্ঠ নাটক, মহৎ ট্র্যাজিডি 'ফেদ্র্'-এর নামভূমিকায় এই দুই মহৎ শিল্পীর অভিনয় দিগ্‌দর্শক হয়ে আছে। এবং ওই নন্দনতাত্ত্বিকের যুক্তি খণ্ডন করে দিচ্ছে। তাই সেই অভিনয়ের বিবরণ উদ্ধার করছি।

" — সপত্নিপুত্র ইপোলিতের প্রতি আসক্ত হয়ে রানী ক্রোধে অপমানে জর্জরিত। মিথ্যা অভিযোগের সাহায্যে তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে স্বীয় উচ্চণ্ড প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির তর্পণে উদ্যত হয়েছে, ট্র্যাজেডির অবসান তার প্রাণপাতে। সারা বার্নার্ডের পরিকল্পনায় 'ফেদ্র্' একটি বিশালাঙ্গী, চলচঞ্চলা রমণীর মূর্তি পরিগ্রহ করত, তার মধ্যে প্রত্যাখ্যাত প্রেম হিংসার নৃশংস শিখায় প্রজ্বলিত হয়েছে। প্রবঞ্চিত স্বামীকে ক্রোধান্ধ করে তোলার জন্য তার সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রে

কোনও ফাঁক নেই। সারার আবেগমুখর বাক্‌চাতুর্যে, 'ফেদ্র্' যেন জ্বালাময়ী রুদ্রাণীতে পরিণত হত। কেবল রাজ্যশোষণে সমর্থ নয়, নিজের অদৃষ্টকে উদ্দাম হৃদয়ের মর্জি মতো চালানর শক্তিও সে রাখে। সারার অভিনয় যে উৎকর্ষে গিয়ে পৌঁছত-তা সফোক্লেসের যোগ্য। তেমনি আরণ্যক, তেমনি মহিমময়, তেমনি নির্মম। সে 'ফেদ্র্' সংরক্ত সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি রানীর মতো রানী।"

"–এই দৃশ্যে দুজে-কে দেখলে তৎক্ষণাৎ মনে হত যেন গভীরতম দুঃখের সংস্পর্শে এসেছি, এ দুঃখ প্রত্যাখ্যাত প্রেমের, আত্মগ্লানির দুঃখ। তার সন্নিধি থেকে কিসের একটা সুরভিশ্বাস নির্গত হত। সে যেন ভবিতব্য-পীড়িত নিরাশ নিঃসহায় নারীত্বের পরিমল। ইপোলিতকে নির্বাসনে পাঠানর চক্রান্ত প্রেমার্তের দুর্বলতায় অভিষিক্ত হয়ে উঠত। মনে হত যে সর্বনাশা প্রলয়ের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে নির্দয়তার ভান করা–তার দুস্থ মস্তিষ্কে শুধু এই সংকল্পের বিবর্তন চলত যে–যার জন্য সে এত দুঃখ পেয়েছে, সেই প্রেমকে উচ্ছেদ করা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই অনাথা ম্রিয়মাণ নারীর মধ্যে রানীকে হারানর কোনও উপায় থাকত না–।"

অনূদিত এই বিবরণ অভিনয়শিল্পে সৃষ্টিরহস্যের এক অকপট প্রমাণ। যে দর্শক এ বিবরণ দিয়েছেন তিনি তো এই সৃষ্টিমাহাত্ম্য নিজেই উপলব্ধি করেছেন। নটীর সংবেদন এবং অভিপ্রায় সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার গূঢ় তাৎপর্যে পরিপূর্ণভাবে স্বপ্রকাশ। এই কাজ শিল্পী ছাড়া সম্ভব? গিরিশচন্দ্রের এবং অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী সাহেবের অভিনীত 'বলিদান' নাটকে করুণাময় চরিত্রের অভিনয়, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল মিত্র, দানীবাবু এবং শিশিরকুমারের, 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের চরিত্রের অভিনয় এই একই প্রক্রিয়ায় স্বতন্ত্র সৃষ্টি হয়ে রয়েছে–কেননা তাঁরা যে বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন।

প্রাচ্য দেশীয় এক শিল্পীর কাহিনী এই সূত্রে বলে নিই। এক রাজা বিদেশের কোন রাজসভায় একটি অপূর্ব নিসর্গচিত্র দেখে দেশে ফিরে এসে তাঁর রাজসভার চিত্রকরকে ফরমায়েশ করলেন একটি নিসর্গচিত্র অঙ্কিত করতে। এবং তাঁর রাজ্যের একটি সুন্দর জায়গার উল্লেখ করলেন। চিত্রশিল্পী সেই জায়গায় রওনা হয়ে গেলেন এবং প্রায় এক বছর সেই জায়গায় থেকে রাজসভায় ফিরে এলেন। রাজা সাগ্রহে ছবি দেখতে চাইলেন। শিল্পী বললে যে, সে এবারে ছবিটি আঁকতে শুরু করবে। রাজা চটে গেলেন। শিল্পী রাজাকে বললে, 'মহারাজ আপনি তো ওই বিশেষ জায়গায় বিশেষ কোন মুহূর্তের বা কালের ছবি আঁকবার

নির্দেশ দেননি। তাই সারা বছর ওখানকার, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রি এবং সকল ঋতুতে ওই জায়গা কেমন দেখতে তাই দেখে এসেছি—এবারে সেই জায়গার আত্মাটা আমার ছবির মধ্যে ধরবার চেষ্টা করব!'—শিল্পের সারকথা বোধহয় এইটেই। সে বস্তুর আকারকে অনুকরণ করে না—তার অন্তর্লীন সত্তাকে প্রকাশ করে এবং সেটা তার নিজস্ব সৃষ্টি। সে কেবল নাট্যকারকে অনুকরণ করে না—তার অভিপ্রায় বুঝে—আপন কল্পনা দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করে।

"অভিনয় একটি শিল্পকলা রূপে গণ্য হইয়া থাকে।"—অভিনয়ের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করতে 'ভারতকোষ'-এ শ্রী শম্ভু মিত্র এ কথা বলেছেন। শিল্প কী? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়ে থাকে, যে শিল্প হল সেই অভিজ্ঞতা যা কোন এক শিল্পীর সৃষ্টি; সেই শিল্পবস্তুটি সম্পূর্ণতা লাভ করে সহৃদয় মানুষের রসাস্বাদনের মধ্যে। অর্থাৎ ভোক্তা মানুষের কাছে সেই রস পরিবেশিত হওয়া চাই এবং সেই মানুষের সেই শিল্পরস অভূতপূর্বরূপে আস্বাদ করা চাই। একজন চিত্রকর, একজন ভাস্কর, একজন সঙ্গীতশিল্পী তাঁদের আপন-আপন সৃষ্টিকর্মের মধ্যে বিচিত্র আবেগকে সৃষ্টি করেন। মানুষ সেই আবেগ-উত্তাপ অনুভব করতে পারেন প্রত্যক্ষণের মধ্যে। প্রত্যেক শিল্পের আবেগ স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে সৃষ্ট হয়। এ সম্পর্কে শ্রী শম্ভু মিত্রের প্রাগুক্ত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করতে সাহায্য করবে। তিনি লিখেছেন,

"প্রত্যেক শিল্পকলারই একটি নিজস্ব ও স্বাধীন প্রকাশভঙ্গী থাকে যাহার দ্বারা উহা এমন কিছু আবেগ সৃষ্টি করিতে পারে যাহা অন্য কোনও শিল্প পন্থায় সম্ভব নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, গানে যখন একটি বিশেষ পর্দার পর আরও একটি বা একাধিক বিশেষ পর্দা লাগানো হয়, তখন তাহা শ্রোতাদের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহা অন্য কোনও প্রকারে অনুভবে সঞ্চারিত করা সম্ভব নহে। চিত্রেও সেই রূপ। বিশেষ একটি রঙে বা বিশেষ একটি রেখায় ইহা যে আবেদন দর্শকের মনে জাগাইয়া থাকে তাহা অন্য কোনও প্রকারে সম্ভব নহে। সেইরূপ অভিনয়েও বাচনভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী ও অভিনেতার সত্তার অভিক্ষেপণ দ্বারা এমন কিছু আবেগ সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়া উঠে যাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না, আঁকিয়া প্রকাশ করা যায় না, বা গাহিয়া প্রকাশ করা যায় না।"

শিল্পের যে লক্ষণগুলির দ্বারা আমরা ভাস্কর্য, চিত্র এবং সংগীতকে শিল্পের পর্যায়ে ফেলছি, অভিনয়ের ক্ষেত্রেও সেই লক্ষণগুলি বর্তমান। এখানেও একজন শিল্পী বিশেষ রসসৃষ্টির কাজে নিয়োজিত এবং সে রস অপরের মনে স্রষ্টার কুশলতায় সঞ্চারিত হয়। শিল্প উপভোগের দ্বারা মানুষের মনের যে শুদ্ধি, মানুষের চিন্তার রাজ্যে যে ঢেউ এবং তার ধাক্কা তা সবই অভিনয়শিল্পে সম্ভব হয়।

তবু প্রশ্ন ওঠে অভিনয় কি কেবলমাত্র প্রকৃতির অনুকরণ? অভিনয়কে শিল্প বলে যাঁরা মানতে চান না তাঁদের যুক্তি হল যে অভিনেতারা নিজেরা কোনও সৃষ্টি করছেন না। নাট্যকারের সৃষ্ট শিল্পকে রূপ দিচ্ছেন মাত্র। একটা চরিত্রের যা কিছু ভাবনা, চিন্তা কার্যাবলী সবই নাট্যকার তাঁর আপন কল্পনার দ্বারা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, কাজেই অভিনেতাকে স্বতন্ত্র স্রষ্টা বলা চলে না। এরই চরম অভিব্যক্তি দেখি প্লেটোর লেখায়। সক্রেটিস ও এক আবৃত্তিকার 'ইঅন্'-এর আলোচনার মধ্যে তিনি বলেছেন :

"সক্রেটিস।...তুমি যে হোমারের কাব্য ভালো আবৃত্তি করতে পারো তার কারণ এ নয় যে তুমি বড়ো শিল্পী, - তার কারণ এই যে তোমার মধ্যে একটা ঈশ্বর-দত্ত শক্তি কাজ করে এবং তার বলে তুমি শ্রোতাদের অভিভূত করে ফেলো।...যে সমস্ত বড়ো কবি, মহাকাব্য রচনা করেছেন, তাঁরা সবাই ঐশ্বরিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন - তার জন্যে কোনও শিল্পনৈপুণ্যের দরকার হয়নি।"

অর্থাৎ অনুপ্রেরণা ও ঐশী শক্তিই সৃষ্টির মূল রহস্য। বেচারী ইঅন বড় দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু যুক্তি দেবার চেষ্টা করে নিজের স্বপক্ষে — কিন্তু প্রতিপক্ষ যে স্বয়ং সক্রেটিস প্রমুখাৎ প্লেটো। তিনি আবারো বলেন :

"ঈশ্বর কবির মনকে অধিকার করে তাকে তাঁর ভৃত্যের মতো ব্যবহার করেন - ভগবানই আসল বক্তা, কবি কেবল তাঁর বক্তব্যের বাহন। ...এর থেকে অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণ হয়ে যায় যে সব কবিতাকে বা কাব্যকে আমরা মহৎ বলি সেগুলো আসলে ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং কবিরা ঈশ্বরের সৃষ্টির ব্যাখ্যাকার মাত্র। ... আর তোমরা কবিদের সৃষ্টির ব্যাখ্যা করো।... (অর্থাৎ) তোমরা হলে ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যাকার।"

এই প্রসঙ্গেই তিনি ঈশ্বরকে মূল চুম্বক শক্তি বলেছেন, কবিরা হলেন সেই চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট লৌহ খণ্ড যা আকর্ষণের ফলে নিজেও খানিকটা চৌম্বক শক্তি সঞ্চয় করে — সেই চৌম্বক শক্তির আকর্ষণে আবৃত্তিকার আকৃষ্ট হয়ে একই উপায়ে খানিকটা চৌম্বকত্ব লাভ করছে এবং সেইটুকু ক্ষমতাতেই সে দর্শক আকর্ষণ করছে। সেই প্রাচীনকাল থেকেই এ তর্ক চলে আসছে। কিন্তু শিল্প সম্পর্কে আমাদের ধারণা অবশ্যই বিবর্তিত হয়ে এসেছে। এবং আজকে তাই প্লেটোর অন্য অনেক ধারণাকে (তাঁর কালে তা যতই সত্য বলে গ্রাহ্য হোক্ না কেন) ধ্রুব বলে মানা যায় না।

কিন্তু অভিনেতার সৃষ্টির উৎস কী, এ তর্ক আজও সমান উৎসাহে চলে আসছে। প্রসঙ্গত এক জাপানী অভিনেতার কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি 'নো' নাটকের শিল্পী ; একদিন তিনি দেখলেন যে তাঁর পালিত পুত্র রাস্তায় এক বৃদ্ধা

মহিলার পিছনে-পিছনে যাচ্ছে এবং সেই বৃদ্ধার হাঁটা, থামা, ভঙ্গি ইত্যাদি অনুকরণ করে চলেছে। তিনি পরে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে ছেলেটির ধারণা যে সে এই অনুশীলনের দ্বারা এক কালে বৃদ্ধা মহিলার চরিত্রে পারদর্শী অভিনেতা হয়ে উঠবে। অভিনেতা-পিতা তাকে বললে : "তবে তুমি কোনদিনই 'নো' নাটকে অভিনয় করতে পারবে না। তোমার মনের মধ্যে সেই বিশ্বাসটা আনতে হবে যে তুমি একজন বৃদ্ধ—তখন দেখবে বাইরের লক্ষণগুলো আপনিই ফুটে উঠবে।"

উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী অভিনেতা কগ্তা ককল্যাঁ শিল্পকে বলেছেন "একটা বিন্যাস যাতে কাব্যের আভরণ থাকবে এবং মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে সত্য হিসেবে। এই কাজ সম্পন্ন করতে চিত্রশিল্পীর উপকরণ হিসেবে রং থাকে, তুলি থাকে, থাকে পট ; ভাস্কর গ্রহণ করেন পাথর, মাটি, যন্ত্র ; কবির আছে শব্দ, সংগীত - অর্থাৎ ছন্দ, সুর, মাত্রা। এই উপকরণ এবং মাধ্যমের ভিন্নতাই শিল্পকে স্বতন্ত্র করে তোলে। আর, অভিনেতার উপকরণ হল সে নিজে।—তার মুখ, তার দেহ, তার জীবন হল তার উপকরণ ; এই নিয়েই সে কাজ করে, এই নিয়েই সে গড়ে তোলে তার সৃষ্ট শিল্প।

আমরা মানি যে অভিনয় যখন শিল্প হয়ে ওঠে তখন এই উপকরণ এবং নাট্যকার-সৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন করেই মহৎ অভিনয়শিল্পী কাজ করেন এবং সৃষ্টি করেন। তাই নাট্যকারের সৃজিত চরিত্রের মুখে যে সংলাপ তা ছাপার অক্ষরে পড়ে যে ধারণা পাঠকের মনে জন্মায়—সে চরিত্রের অভিনয় দেখতে গিয়ে শিল্পীর সৃষ্টির স্বাদ পাই আমরা। এ সম্পর্কে শ্রী শম্ভু মিত্র উদাহরণ হিসেবে যা উল্লেখ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য।

" 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—এই কথা কয়টি 'প্রফুল্ল' নাটকে হাজারবার পড়িয়াও ইহার উচ্চারণের মাধ্যমে অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ গভীর ব্যথার যে বিশিষ্ট রূপটি প্রকাশ করিতে পারিতেন তাহা অনুমান করা অসম্ভব। বা 'সীতা' নাটকে শিশিরকুমার যে ভাবে 'শত্রু! শত্রু!' বলিয়া লবের গণ্ডে মৃদু-মৃদু আঘাত করিয়া এক জটিল আবেগ সৃষ্টি করিতেন, তাহাও তেমনই না দেখিয়া আন্দাজ করা সম্ভব নহে। এইগুলি ভাষাকে ছাড়াইয়া ভাষার ব্যবহারের উদাহরণ স্বরূপ স্মর্তব্য।"

নাট্যকারের রচনা এখানে উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হল। এ ছাড়া অভিনেতার আপন দেহ, নিজ জীবন উপকরণ হিসেবে অন্যান্য শিল্পের শিল্পীর মতো পূর্ণকর্তৃত্বাধীন রেখে নিজের সৃষ্টির কাজ করে যায়, যে সৃষ্টি স্বতন্ত্র শিল্পের মর্যাদা পাবার যোগ্য।

"প্রত্যেক সুঅভিনেতা, প্রত্যেক 'আর্টিস্ট' শিল্পী নিজের মস্তিষ্কের মধ্যে দুইটি মানুষকে বহন করেন। একজন যিনি সৃষ্টি করেন, আর একজন যিনি সৃষ্ট হন। একজন 'বিচারক' — একজন 'কর্মী'।" — নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের এই উক্তিটির সঙ্গে বহুদিন পূর্বে ইতালীয় প্রখ্যাত অভিনেত্রী এলিওনেরা দুজের একটি উক্তি স্মর্তব্য। তিনি স্তানিস্লাভস্কিকে উপদেশচ্ছলে বলেছিলেন, "tutto recordare e tutto dimenticare." অর্থাৎ নাট্যশিল্পের মূলমন্ত্র হচ্ছে একই সময়ে সমস্ত মনে রেখে সমস্ত ভুলে যাওয়া।

অভিনয়রীতির উৎকর্ষ, স্বরসাধনায় সিদ্ধি, ভাব ও ভাবের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি, এগুলোই নাট্যামোদের মুখ্য সহায়। আত্মার প্রদোষ অন্ধকারে যে আবেগের উদয় হয় তা পদ্ধতি ব্যতিরেকে পাদপ্রদীপের ওপারে দর্শকদের কাছে পৌছনো অসম্ভব। এই উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে অভিনেতাকে অভিনেয় চরিত্রের আবেগ অনুভব করলেই শুধু চলে না — তাকে চরিত্রের সেই আবেগকে দর্শক সমক্ষে প্রদর্শনও করতে হয়। নইলে সে-অভিনয় ব্যর্থ হতে বাধ্য। সমস্ত শিল্পকলার লক্ষ্য তার উপভোক্তাদের জন্য। অভিনয়শিল্পে এই কথাটা আরও সত্য। কেননা অভিনয় তো নির্জন গৃহে সম্পাদিত হয় না। এই আবেগ এবং পদ্ধতি ব্যতিরেকে তার প্রকাশ যে সম্ভব নয় এই মূল কথাটা অভিনয়তত্ত্বে অভিনেতার দ্বৈত সত্তা হিশেবে বিবেচিত। বস্তুত, অভিনয়কালীন অভিনেতাকে দুটো সত্তা বজায় রাখতে হয়। একজন যে চরিত্রটি সৃষ্টি করছে, অভিনীত চরিত্রের আবেগ অনুভব করছে, আর একজন যে সেই সৃষ্ট চরিত্র বা অনুভূত আবেগকে বুদ্ধি দিয়ে, বিচার করে, মঞ্চের কলাকৌশল মনে রেখে দর্শক সমক্ষে প্রকাশ করছে।

অভিনেতার এই দ্বৈত সত্তা বজায় রাখতে হয়। সমস্ত ভুলে গিয়েও সমস্ত মনে রাখতে হয়। এ সম্পর্কে অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেনি দিদেরো তাঁর *Paradox*-এ বলেছেন যে আবেগাপ্লুত অভিনেতা "can neither judge his effects, nor consistently achieve them." — এইজাতীয় অভিনেতার নিজের মনের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তার ফলে মঞ্চে করণীয় ক্রিয়াকৌশল সম্পর্কে সে অবহেলা দেখায়। এর চূড়ান্ত নিদর্শন হিশেবে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪ অব্দের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। সিসেরো অবশ্য সেই অভিনেতার আবেগসম্পন্ন অভিনয়ের খুব খ্যাতি করেছেন। আবেগসম্পন্ন সেই অভিনেতা একটি নাটকের প্রতিহিংসার দৃশ্যে এমনই ক্রোধান্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে মঞ্চে

বিচরণকারী এক ভৃত্যকে তিনি তাঁর হস্তধৃত রাজদণ্ড দিয়ে আঘাত করেন—সে আঘাতের প্রচণ্ডতায় সেই হতভাগ্য ভৃত্য-চরিত্র-অভিনেতা মারা যায়! এর আবেগ অনুভব করবার ক্ষমতা খুবই প্রবল কিন্তু নিজের ওপর কর্তৃত্ব নেই।

দিদেরো বলেছেন যদি ধরে নেওয়া যায় যে একজন ভাল অভিনেতা বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত না হয়ে কেবল আবেগ দিয়ে অভিনয় করে চলেছে এবং নিজেকে ভুলে গিয়ে আত্মসমর্পণ করছে চরিত্রের আবেগের কাছে—তাহলে কী হবে? উত্তরে তিনি বলেছেন—সে হয়তো নেশা ধরাতে পারে,—একটি বা দুটি কিংবা তিনটি সুন্দর মুহূর্ত তৈরি করতে পারবে! কিন্তু সেটাই কি সব! সুন্দর এক-আধটা মুহূর্ত অথবা সর্বাঙ্গসুন্দর একটা ভূমিকা—কোন্‌টা শ্রেয়ঃ? একটা চরিত্রের আলো-আঁধারি, তার শক্তি এবং দুর্বলতা, শান্ত এবং ভয়ংকর মুহূর্তের মধ্যে একটা সংযোগসেতু, সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং সামষ্টিক রূপকল্পে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ—এ সবই স্থির মস্তিষ্কের কাজ। গভীর বিচারবোধের কাজ। সু-রুচির নিদর্শন। অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে এ কাজ সম্ভব নয়—সম্ভব নয় অনুশীলিত পদ্ধতি ব্যতিরেকে। অভিনয়ে দ্বৈত সত্তার উল্লেখ এই সূত্রেই। সমস্ত পরিকল্পনাটা মাথায় না থাকলে সে অভিনয় অর্বাচীন হয়ে থাকতে বাধ্য। দিদেরোর অভিনয়তত্ত্বে তাই 'হৃদয়াবেগের ওপর মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণের কথা খুব জোরালভাবেই প্রতিষ্ঠিত।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তাই বলেছেন, "যে মুহূর্তে 'লবে'র মুখ দেখিয়া আমি 'সীতা'র কল্পনায় আত্মহারা হইয়া যাই—সেই মুহূর্তেই 'লব'কে আমার দক্ষিণ-পার্শ্বে সরাইয়া নিজের মুখে ওই পাঁচশো-ওয়াট্-ক্যাণ্ডেল-পাওয়ারের সবটুকু আলোর সুযোগ সুবিধা সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে হয়। আত্মহারা হইলে কি এটা সম্ভব হয়।" এই প্রসঙ্গেই তিনি বিচারক ও কর্মী এই দুই সত্তার সুষ্ঠু সমন্বয়ে কীভাবে সত্যিকার 'আর্টিস্টে'র জন্ম হয় সে কথাও বলেছেন। "Actors on Acting" প্রবন্ধে কক্লাঁ অভিনেতার এই দ্বৈত সত্তা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। এই দ্বৈত সত্তাই হল অভিনেতার সম্পদ এবং বৈশিষ্ট্য। তার একটা সত্তা হল যে অভিনয় করছে সে। কক্লাঁ এই সত্তাকে আখ্যা দিয়েছেন 'যন্ত্রী'। অপর সত্তা হল 'যন্ত্র'—যা ব্যবহার করে অভিনয়কার্য প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম সত্তা,—যে চরিত্র অভিনীত হবে তাকে প্রণিধান করছে, আস্বাদ করছে, কিংবা বলা যায় যে, যেহেতু চরিত্রটা নাট্যকারের সৃষ্টি—সেইহেতু প্রথম সত্তা নাট্যকারের অনুভূতিকে আপন অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে। দ্বিতীয় সত্তা 'যন্ত্র' এই অনুভূত

চরিত্রটিকে রূপ দিচ্ছে। প্রথম সত্তা স্বভাবতই দ্বিতীয় সত্তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে সব সময়ে — তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে — বিশেষ করে মঞ্চে।

অভিনয় দেখতে-দেখতে যখন দর্শক অভিভূত সেই তন্ময় মুহূর্তেও অভিনেতাকে তার প্রথম সত্তাকে জাগিয়ে রাখতে হয় সতর্ক প্রহরীর মতো — যাতে সে তার সমস্ত ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া লক্ষ রাখতে পারে। ভাবাবেগে ভেসে গেলে তার চলে না। এবং যে কাজ সে করছে সে কাজে জীবন থেকে সে যে রূপ আহরণ করছে — সেই জীবনকে — সেই সত্যকে ভুলে গেলেও তার চলে না। ককলঁ্যার মতে দ্বিতীয় সত্তার ওপর প্রথম সত্তার যত বেশি কর্তৃত্ব বজায় থাকবে — অর্থাৎ অনুভূতিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকাশ করার কর্তৃত্ব অভিনেতার যত বেশি থাকবে, অভিনেতা ততই সফলতার দ্বারে এসে পৌঁছবে। শিশিরকুমারের আলোচ্য উক্তি এই মতবাদেরই পরিপোষক।

স্তানিস্লাভস্কি ককলঁ্যার মতের সমালোচনা করলেও অভিনেতার দ্বৈত সত্তাকে অস্বীকার করেননি। প্রকাশ-পদ্ধতি এবং আবেগ-অনুভব নিয়ে তিনি অবশ্যই জোরাল তর্ক তুলেছেন। তাঁর সমালোচনার মূল কথা হল মানুষের সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভূতিগুলিকে কেবলমাত্র কৌশল দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু এ আলোচনা আমাদের নিয়ে যাবে প্রসঙ্গান্তরে।

মারিওনেট ও মানুষ

'—নিজেকে কথনো একলা অনুভব করেছ রাত জেগে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে থেকেছ,—একলা ঘরের মধ্যে খাটের বাজু আঁকড়ে ধরে কাউকে আর্ত হাহাকার করতে শুনেছ,—দেখেছ তার সারা শরীরের থরথরানি?—কল্পনা কর সেই মানুষ রাতের অন্ধকার পাড়ি দিয়ে আলো দেখতে পেল,—আলোময় আকাশের দিকে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে সংকল্প-বদ্ধ দৃঢ় পদক্ষেপে সবার অলক্ষ্যে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ল পথে। তখন দেখা হল ক্ষিপ্ত জনতার সঙ্গে, সেই মানুষ কী করে তার অনুভূতিকে, উপলব্ধ সত্যকে, তার ছটফটানিকে প্রকাশ করবে? —তোমার অভিজ্ঞতায়, কল্পনায়, এই কষ্ট, এই বেদনা উপলব্ধ হয়ে থাকলে তবেই তোমার মধ্যে দিয়েই সেই মানুষটিকে দেখতে পাব। তখন দেখবে অহেতুক চেঁচাতে হচ্ছে না—গলার শির ফুলিয়ে; আবেগকে টুথপেস্ট-এর মতো টিপে বের করতে হবে না; কারণ সে লোক মিথ্যাচরণ করছে না, সে তার নিজের কথা ব্যক্ত করছে—নিজেরই বেদনাকে ভাষা দিচ্ছে।' —নির্দেশক অভিনেতাকে বোঝাচ্ছেন একটা দৃশ্য—সেই সূত্রেই বলছেন কথাগুলি। তার মধ্যে কল্পনাকে ধাক্কা দিয়ে, তাকে সক্রিয় করে সৃষ্টি-শীল করে তোলার প্রয়াসে নিযুক্ত তিনি। '—এ তো মেঠো বক্তৃতা নয়; সেখানে তোমার বোধ, ভূমি, তোমার যথার্থ আবেগ এগুলোর সঙ্গে কথাগুলো সম্পর্কশূন্য হলেও কাজ চলে যাবে। সেখানে শুধু শব্দের ঝঙ্কারে শ্রোতার মনে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করবে। সেখানে কথাগুলোর ওপর একটা ঝোঁক দিয়ে শ্রোতাকে উত্তেজিত করাটাই তোমার কাজ; তুমি পেশাদার বক্তৃতাবাজ হতে পার, রাজনৈতিক নেতাদের হাতে কলের পুতুল হয়ে বাঁচাতেই তোমার সার্থ-কতা; ট্রেনের ফেরীওয়ালাদের মতো। এখানে শিল্পী হিশেবে তোমার কাজ তোমার ভেতরটাকে প্রকাশ করা। অর্থাৎ মানুষটাকে দেখতে চাই; শুধু কথা নয়,—নাট্যকারের সংলাপ অনিবার্য হচ্ছে যে অনুভবক্ষম মনে, সেই মনের অধিকারী ব্যক্তিটিকে দেখতে চাই·· লোককে ধোঁকা দেওয়া কাজ নয়—নিজের আবেগকে

প্রকাশ করা—নিজের গভীর অভিজ্ঞতাকে রূপ দেওয়াটাই কাজ।' —মহলা চলছিল : নির্দেশক অভিনেতাকে কলের পুতুল করতে চাননি—চেয়েছেন শিল্পী হিশেবে সার্থকতার পথে চালনা করতে। সে যেন নিজেকে প্রকাশ করতে পারে তার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে। সর্বগ্রাসতন্ত্রের একনায়ক নন—সৃজনসমবায়ের যথার্থ কর্ণধার তিনি। স্বাভাবিক প্রযোজনায় আস্থাবান্, নটসমবায়ের একাত্মবোধ তাঁর লক্ষ্য।

এর থেকে সম্পর্ক নির্ণীত হয় নির্দেশক ও অভিনেতার মধ্যে। থিয়েটার-শিল্পের দুটো বৈশিষ্ট্য এই সম্পর্ক নির্ধারণ করছে। প্রথমত, এ তিলোত্তমা শিল্প নটসমবায়ের একাত্মবোধ থেকে উৎপন্ন। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, এ প্রযোজনার মূল হল অভিনেতা,—অর্থাৎ মানুষ। নির্দেশকের শিল্পসাধনা আর-পাঁচটা শিল্পসৃষ্টির উপাদানের সামিল বলা হলেও সে তার আপন অধিকারেই স্রষ্টা। গোলমালটা বাধল বোধহয় এইখানেই। অখণ্ড অভিনয়শিল্পে কে শিল্পী? নির্দেশক যদি দাবি করেন যে তিনিই একমাত্র শিল্পী থিয়েটারের, বাকি আর সব উপকরণ-মাত্র এবং তাঁকেই সব উপকরণগুলো একত্র সংকলন করতে হয় একটা সমগ্র শিল্প সৃষ্টি করতে, তবে এই অভিনেতাকে নিয়ে, এই প্রাণবান্ উপকরণ সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অরাজকতার প্রশ্ন উঠিয়ে সেটা যে অখণ্ড শিল্পসাধনার পরিপন্থী—তা বলতেই হয়। নাট্যকারের নাটক, চিত্রশিল্পীর মঞ্চসজ্জা, সাজপোশাক, এই বিভিন্ন উপকরণগুলি বিভিন্ন শিল্পীর সৃষ্ট বস্তুমাত্র এবং এই বস্তুগুলিই নির্দেশক তাঁর প্রযোজিত নাটকের আদর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু অভিনয়-শিল্পীর সৃষ্ট শিল্প, প্রাণহীন বস্তুপদবাচ্য নয়—তা মানুষটার সঙ্গেই যুক্ত। কাজেই যদি মেনে নেওয়া হয় যে পরিচালকই একমাত্র শিল্পী থিয়েটারে—তাহলে তাঁর শিল্প-উপাদানকে শুধুমাত্র উপাদান হয়েই থাকতে হবে, এ দাবি উঠবেই। অভিনেতা যে মারিওনেট্-জাতীয় কলের পুতুলমাত্র তাও স্বীকার করতে হবে। তখন সেটাই নটশিল্পের আদর্শ বলে বিবেচিত হবে।

কিন্তু আমি অভিনেতা—আমি মানুষ—আমি আপন অধিকারেই স্রষ্টা ; শুধু উপকরণমাত্র নই—তার চেয়েও বেশি কিছু। এ আমার দম্ভ নয়—এ আমার যথার্থ অহংকার। আমি কী করে ভাবব যে পরিচালকের হাতে সুতোর বাঁধন আমার নিয়ন্ত্রক ; আমি কী করে মানব যে আমি পুতুল নাচের পুতুলমাত্র।

'পুতুল নাচে'র পরিচালক স্বাভাবিকভাবেই পুতুল-নটের স্বৈরাচারের প্রতিবাদ করতে পারেন। বলতে পারেন যে 'পুতুল-নট' সমগ্র সাজসজ্জার অধীন

থাকতে বাধ্য। শৃঙ্খলার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এ শৃঙ্খলা কোনক্রমেই জাহাজের নাবিক আর ক্যাপটেনের সম্পর্কের সূত্র ধরে বিচার্য নয়। আমি তো বিদ্রোহী নই যে শৃঙ্খলার নামে আমার হাতে দড়ি পড়বে। আজকের থিয়েটারে নির্দেশক তো অনস্বীকার্য বাস্তব। তাঁর ভাবনা, তাঁর চিন্তা, যুক্তি, নাটকের মূল বক্তব্য সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য এবং এই অখণ্ড শিল্পমাধ্যমে তাঁর প্রকাশ-প্রচেষ্টার সঙ্গে কীভাবে অভিনয়, মঞ্চ, আলো, সুর যুক্ত হবে—এ সব আলোচনার তো আমিও অংশীদার। একটা অরাজক ব্যষ্টির জন্ম দিতে আমি তো চাই না—আমি নাটকের মূল সুর এবং পরিচালকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমার বোধকে মিলিয়ে একটা চরিত্রকে বুঝতে উন্মুখ। সে অঙ্গীকার তো করেছি,—যৌথশিল্পের আত্মাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

একজন ভাস্কর বা একজন চিত্রশিল্পীর সঙ্গে থিয়েটারের শিল্পী-পরিচালকের তফাৎটা স্বীকার করতেই হবে। প্রাণহীন উপকরণ দিয়ে ভাস্কর, চিত্রশিল্পী তাঁদের মনোগত বাসনাকে, কল্পনাকে, আদর্শকে রূপ দিতে পারেন এবং সেই শিল্পমাধ্যমে দর্শকের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় ঘটে। কিন্তু থিয়েটারের শিল্পীর প্রধান উপকরণ প্রাণহীন বস্তু নয়—মানুষ; তাই এ শিল্পের প্রকাশও জটিল। এবং যে যাই বলুক অভিনয়শিল্পই নাট্যপ্রয়োগের প্রধান অঙ্গ। পাদ-দীপের প্রভামণ্ডলের ভেতরে এবং বাইরের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র হল অভিনেতা। অনন্যতন্ত্রী পরিচালককে দেখতে পাওয়া যায় 'মারিওনেট্'-এর খেলায়। কিন্তু অভিনয়শিল্পে নটের ব্যক্তিস্বরূপই নাটককে সঞ্চরণশীল করে তোলে, কারণ সে ব্যক্তিস্বরূপের সারতত্ত্ব হচ্ছে স্বাতন্ত্র্য এবং প্রয়োজনমতো বিস্তারণ ও সংকোচনের অনন্ত ক্ষমতা। নট তার অন্তরের সমবেদনাকে, অঙ্গলীলায় প্রতিমূর্ত করে দর্শককে বিচলিত ও বিগলিত করে। থিয়েটারে পরিচালক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, সুরকার প্রত্যেকে দর্শকের কাছে অপ্রত্যক্ষভাবে বাঙ্ময় হয়ে ওঠেন নটের মাধ্যমে। পিকাসোর ছবির উপকরণ—রং, তুলি, ক্যানভাস, কোনটাই বিচ্ছিন্নভাবে শিল্প নয়, ওগুলো উপকরণবস্তুই—তাই তাঁর একক-সৃষ্ট শিল্পবিচারের সময় ওগুলোর আত্মপ্রকাশের প্রশ্ন ওঠে না। যেমন কোন অবুঝ শ্রোতার বিটোফেনের 'সিক্সথ্-সিম্ফনি' ভাল লাগে কেননা তার মধ্যে কোকিলের কুহুরবের অনুরূপ সুর বর্তমান—এ উদাহরণ এক্ষেত্রে অর্বাচীন মনের পরিচায়ক। কেননা থিয়েটারের সঙ্গে এগুলি তুল্যমূল্য নয়। প্রযোজকের অনন্যতন্ত্র যদি দাবি করে যে নাট্যশিল্পও ঐরকম উপকরণ নিয়ে একক সৃষ্টি তবে অবশ্যই

'সৃষ্টির উপকরণ হিশেবে জ্যান্ত মানুষ ব্যর্থ—কারণ সে নিয়ত পরিবর্তনশীল'—এরকম প্রলাপের প্রশ্রয় দিতেই হবে। তার কারণ নাট্যশিল্প যে কতকগুলি শিল্পের সমন্বয়ের ফলে এক জটিল শিল্পরূপ এ সত্যকে তাঁরা অস্বীকার করে পরিচালক নামক একমাত্র শিল্পীর আইডিয়াকে, একটিমাত্র আবেগের ডিজাইন বা প্যাটার্নকে রূপায়িত করাই একমাত্র লক্ষ্য বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে পরিচালক সুরশিল্পী বা ভাস্করের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন না। থিয়েটারশিল্প যে প্রথায় রূপ পরিগ্রহ করে তা ঐরকম একটিমাত্র প্রত্যক্ষ বা একক মাধ্যমের ফল নয়। থিয়েটারশিল্পে মঞ্চকার একজন শিল্পী : তিনি কাজ করেন মঞ্চচিত্রের নিজস্ব মাধ্যমে। থিয়েটারের কাজে তাঁর যোগ তাঁর নিজস্ব শিল্পের শিল্পী হিশেবে। আলোকশিল্পীও—আর-এক জাতের শিল্পী। পরিচালক নিজেও নিশ্চিত করেই আর-একজন শিল্পী। অভিনেতাও শিল্পী। তার মাধ্যম ভিন্ন এবং নির্দিষ্ট। তার ব্যক্তিত্ব, দেহ এবং কণ্ঠস্বর মাধ্যমের অন্তর্গত। এই অখণ্ড শিল্পের মধ্যে যুক্ত থেকেও সে স্বতন্ত্র—নইলে যে তার শিল্পীসত্তা লুপ্ত হয়ে যায়। এইসব কারণেই এ শিল্প জটিল—জটিলতার মধ্যেই এর মুক্তি। হয়তো এই কারণেই 'বিশুদ্ধ শিল্প' বলতে যা বোঝায় (স্থাপত্য এবং সংগীত) তার থেকে এ ভিন্ন। অভিনেতা এবং অভিনয় হল মাধ্যম; উপকরণ নয়, এই মাধ্যমেই নাটকের চরিত্র, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রূপান্তরিত হচ্ছে—থিয়েটারশিল্পে। নাট্যকারের লেখা নাটক, চরিত্র, পরিচালকের নির্দেশ—এগুলো হল অভিনেতার উপকরণ। কিন্তু যে অভিনেতা একটা মানুষকে রূপ দিচ্ছে সে-ও নিজে মানুষ। নাদির শা'র ভূমিকাভিনেতা শিশিরকুমার নাদির শা'র মতোই মানুষ। শিল্প আর স্বভাব। স্বভাব থেকে শিল্পে কখন উত্তরণ ঘটছে? কোন্‌টা মাধ্যম আর কোন্‌টা উপকরণ? বিভেদীকরণের পন্থা সহজ নয়। যদি সহজ করতে হয়, যদি 'বিশুদ্ধ শিল্পের' অখণ্ডতার নামে অভিনেতাকে মৃতের সঙ্গে নিজেকে সমতুল্যজ্ঞানে সৃষ্টির মালমশলা হিশেবে বাঁচতে হয় তবে পরিচালক 'পুতুল নাচ' বা 'মারিওনেট্‌'-এর মাধ্যমে নিজের আইডিয়াকে প্রকাশ করার প্রয়াসে নিযুক্ত থাকলেই পারেন। জীবনঘটিত আবেগ-দম্ভ-গর্ব-সম্পন্ন মানুষ নিয়ে কারবার করবার প্রয়োজন কী? জীবনের, মননের এ অপচয় কেন?

যদি এই হয় যে সুতোয়-বাঁধা পুতুল-কুশীলবেরাই অখণ্ড শিল্পসাধনার অগ্রপন্থী এবং মানুষের সহজ নাট্যবোধ এদের মধ্যেই প্রথম রূপ পেয়েছিল এবং সেই হেতুই আজকের থিয়েটারে রেনেসাঁস আনবার জন্য কলের পুতুলকে নটশিল্পের

আদর্শ করে তার অনুবর্তন বাঞ্ছনীয়, তবে প্রথম প্রশ্ন উঠবে : প্রাথমিক আদর্শ বিবর্তিত হল কেন? পুতুল থেকে মুখোশধারী মানুষ; তার থেকে বৈশিষ্ট্যবর্জিত স্বল্প ক'টি চরিত্র এবং তারও পরে আজকের নাটক, অসংখ্য জটিলতা— অসংখ্য চরিত্রের রূপায়ণ হল কেন? হয়তো নাট্যকারের একাধিপত্য, কোন বিশেষ অধ্যায়ে অভিনেতার স্বৈরাচার, পটশিল্পীর দৌরাত্ম্য এ নটসমবায়ের গণতন্ত্রের মূলে ধাক্কা দিয়েছে তবু প্রযোজক নির্দেশকের অনন্য আধিপত্যের ফলে যদি নাট্যকার এবং অভিনেতার মৃত্যু দাবি করা হয় শুধুমাত্র পরিচালকের আইডিয়াকে প্রকাশ করতে, পরিচালকের একটা প্যাটার্নকে রূপ দিতে তা হলে তা আরও মারাত্মক হবে। ভবিষ্যতে থিয়েটারশিল্পী যদি শুধু action scene এবং voice-এর মাধ্যমে তার অপূর্ব সৃষ্টি সম্ভব করবেন বলে সংকল্প করেন তবে অন্য কোন অনুরূপ শিল্প সম্ভব হলেও হতে পারে—কিন্তু থিয়েটারশিল্প—যা নাট্যকার, অভিনেতা প্রমুখ শিল্পীর সমবায়, তার স্বাং। প্রতারিত হবে।

এঁরা যবদ্বীপের ছায়াবাজীকে সাক্ষী মেনে কিংবা প্রাচ্যের প্রাচীন নাট্যকলার অনুদেশে নটের মুখ মুখোশে ঢেকে তার আবেগসমুখ স্বয়ংবশ অঙ্গচালনাকে সমগ্রতার খাতিরে অনায়াসেই নিয়ন্ত্রণ করার কথা তুলতে পারেন। এঁদের ভাবগতিক দেখে এই সিদ্ধান্ত করা ছাড়া উপায় নেই যে এঁরা লিখিত নাটকের পাত্রপাত্রীর ওপরে আরোপিত চরিত্র-বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী নন। তাই এঁরা অষ্টাদশ শতকের ভেনিসীয় নাট্যরীতি 'কোমেদিয়া-দেলার্তে'র আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চান। সেই নাটকের মানুষেরা ছাঁচে ঢালাই। অভিনেতারা হার্লিকুইন, কলাম্বাইন, কবিরাজ, জুয়াচোর ইত্যাদি—এবং তারা বৈশিষ্ট্যহীন; মনগড়া সংলাপ তারা আবৃত্তি করত। অর্থাৎ মানুষ নিয়ে কারবার করলেও তার ব্যক্তিত্বকে বর্জন করতে হত—ব্যক্তিগত ভাববাঞ্ছনাকে কড়া অনুশাসনে বাঁধতে হত—এই হল তাঁদের আদর্শ। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে এদের বিবাদ অভিনেতার সঙ্গে নয়। অভিনেয় নাটকের সঙ্গেই। নাটকহীন অভিনেতাহীন এদের প্রয়াস সৈন্যদলে নিয়োজিত হলে—সেনাদলের 'রোডমার্চ' নাট্যকলার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হত। কারণ এ ধরনের অনুষ্ঠানে প্রত্যেক সৈনিকের পদক্ষেপ একটি তারে বাঁধা, প্রত্যেক সৈনিক-নটের মুখ একই সর্বজনীন মুখোশে ঢাকা। এদের মুখে মননের চিহ্নমাত্র থাকবে না এবং এদের বিশুদ্ধ প্রয়োগ শিল্পের রসগ্রহণের অন্তরায় হবে না।

অথচ আমি অভিনয়কে শিল্পজ্ঞানে এ কাজে নেমেছি। যদি দাবি করা হয় যে আমার অনায়াস বিচরণ ঘটবে জীবনের সমস্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে—ক্রিকেটের

মাঠ থেকে মনুমেণ্টের পাদদেশে, দর্শন থেকে বিজ্ঞানের রাজ্যে, হাতুড়ি থেকে হারমোনিয়ামের সুরে, দাবার ঘুটির চাল থেকে স্পুটনিকের চলনে পুলকিত হবার অবকাশ থাকবে আমার, তবে আমি যন্ত্রের নাট্-বল্টু হয়ে থাকব কেন পরিচালকের তাঁবেদারি করতে। অথচ এ সব জ্ঞানের প্রয়োজন অভিনেতার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ এবং বিকাশের জন্যই। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে অভিনেতার বোধকে বাড়াবার জন্যেই। কেননা গভীরভাবে জীবনকে জানা গেলেই মহত্তর শিল্পসৃষ্টি সম্ভব।

যদি অভিনেতা সৎ শিল্পী হন তবে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সচেতনতা এবং বোধকে নিয়োজিত করবেন একটা চরিত্রকে রূপ দেওয়ার জন্যে। এবং এক অভিনেতা থেকে অন্য অভিনেতার পার্থক্যটা ধরা পড়ে এই বোধের তারতম্য অনুসারেই। নির্দেশকের সঙ্গে তার আদর্শ সম্পর্ক হবে—নির্দেশকের সহযোগে তার ভাব এবং ভাবনাকে মিলিয়ে নিয়ে চরিত্র সৃষ্টি। অভিনীত নাটকের সামাজিক এবং আদর্শগত ব্যাখ্যা এবং চরিত্রায়ণ নির্দেশক-অভিনেতার মরমী সম্পর্কের মধ্যে একটা পথেই চালিত হবে। মহলার সময় নির্দেশক নির্দেশ দেবেন তাঁর শিল্পীকে। সে নির্দেশ কখনো-বা ব্যাখ্যা কখনো-বা দেখিয়ে দেওয়া। এই নির্দেশগুলি অভিনেতার জীবন-ঘটিত অভিজ্ঞতা থেকে অনেক দেখতা সত্যকে মনে করিয়ে দেবে অভিনেতাকে—কিংবা কল্পনার আশ্রয় নেবে সাহিত্য থেকে। ফলত, নির্দেশক আর অভিনেতার অভিজ্ঞতা, কল্পনা এ দুয়ে মিলেমিশে একটা সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যার সৃষ্টি করে। নির্দেশকের অনুরোধ, নির্দেশ যান্ত্রিকভাবে মেনে নেওয়ার চেয়েও অভিনেতা আরও কিছু সংযোগ করলেন। অর্থাৎ সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগালেন। এইভাবে পরস্পরের আদান-প্রদানে মহলার কাজ এগিয়ে যায়। এইভাবেই পরিচালকের সৃজন-প্রতিভা অভিনেতার শিল্পস্পন্দনে বাসা বাঁধে। তাই তিরস্কার শুনি মহৎ নির্দেশকের কাছে—'তোমরা কি কেবল আমার দেখান উপাদানকেই অনুকরণ করবে? তাই যদি কর তাহলে তো যারা টিকিট কেটে তোমাদের দেখতে আসবে—তারা বলবে যে এদের কোনও স্বাতন্ত্র্য নেই। তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার অভিজ্ঞতা, তোমার কল্পনার পরশ লাগুক অভিনীত চরিত্রে।' জীবনবোধ এবং অভিজ্ঞান এরই ওপর নির্ভর করছে কল্পনাশক্তি। জীবনের নানান্ অভিজ্ঞতার জারকরসে মন্থনে তবেই অভিনেতার কল্পনার প্রসার ঘটে। রিয়ালিটির সঙ্গে পরিচয় অভিনেতার জীবনে অবশ্যই ঘটা চাই।

অভিনেতার অভিব্যক্তিকে স্বভাবসিদ্ধ করে তোলা, ঐতিহাসিক, সামাজিক

ও মনস্তাত্ত্বিক সত্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাবান্ করে তোলা, জীবনের অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া কল্পনাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করা এবং সবার ওপরে অভিনেতার ব্যক্তিত্বের স্পর্শে তার সৃষ্ট চরিত্র শিল্প হিশেবে প্রকাশমান্ কিনা — এই লক্ষ রাখাই পরিচালকের শিল্পসৃষ্টি-সহায়কের ভূমিকার যথার্থ গুরুত্ব। এবং এই কাজে কখনো তিনি হাতে-কলমে দেখিয়ে দিচ্ছেন — কখনো বিস্তারে আলোচনা করছেন, ব্যাখ্যা করছেন। আর অভিনেতা যখন সেই সূত্রে অনুশীলন করছে নবসৃষ্টির জন্যে — তখন নির্দেশক পুষ্পবিলাসীর মতো কান পেতে ফুলের কেয়ারিতে প্রথম প্রাণসঞ্চারের সাড়া শোনবার আগ্রহ নিয়ে উদ্গ্রীব অপেক্ষায় বসে আছেন। এবং এদের পরস্পরের দূরত্ব, পরম্পরা, অঙ্গরেখা, হাবভাব সংকল্প, দৃশ্য সংস্থাপন, আলোর ব্যবহার ইত্যাদি উপাদান সংগ্রহ করেন নাটকখানির পরিণত রূপের জন্য।

অভিনয় যে শিল্প; তাই এ শিল্পের রূপকার প্রয়োজন। 'পুতুল' শিল্পসৃষ্টির রূপকার হতে পারে না। অভিনয়টা শিল্প না হয়ে থিয়েটারে যদি পরিচালক-শিল্পীর প্রকাশই শিল্প হয় তবে তার উপকরণ নাট্-বল্টু-সদৃশ পাত্রপাত্রীর জন্যে শিল্পীর দরকার কী? হয় — শিল্পী নয় এমন মানুষের আমদানী করা হোক্ কিংবা কলের পুতুল! শিল্পীরা আসবেন কেন থিয়েটারে। অভিনেতা হিশেবে যাঁরা শিল্পীশ্রেষ্ঠ, তাঁরা যদি মঞ্চে অভিনয় মাধ্যমে তাঁদের শিল্প প্রকাশ না করতে পারেন তাহলে তাঁদের সার্থকতা কোথায়? অথচ নাটকে নট-দর্শক-সংবাদ ব্যতিরেকে থিয়েটারের সমস্ত উপকরণ কেবল উপকরণ হয়েই থাকবে। যে রহস্যময় সৃষ্টিপ্রবাহ দর্শক অভিনেতাকে সংযুক্ত করে দেয় সেটা কী করে তৈরি হচ্ছে? — নাট্যকারের দেওয়া সংলাপ ও পরিচালকের ব্যাখ্যা এ সবকে ছাপিয়ে অভিনেতার ব্যক্তিত্বের, অভিজ্ঞতার, কল্পনার ছোঁয়ায় একটা তৃতীয় গুণের উদ্ভব ঘটবে অভিনেতার অভিনয়ের মধ্যে — সেটাই অভিনেতার নিজস্ব সৃষ্টি এবং সেটা শিল্প। এই সৃষ্টিকে সহায়তা করছে সজ্জা, আলো, রেখা, এরই ভোক্তা দর্শক। এরই আকর্ষণে শিল্পী আসেন অভিনয়ের আসরে — নিজেকে মুক্ত করতে, নিজেকে প্রকাশ করতে; নিজেকে ভূমিকার সাযুজ্যে বিলীন করেই নয় — নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেও — tutto recordare e tutto dimenticare।

প্রত্যেক বড় অভিনেতার আবেগ এবং প্রকাশভঙ্গিমার অভিনবত্ব থাকবেই। এই অভিনবত্ব তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশের জন্যই সম্ভব। শিল্পী তো নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন না, তিনি প্রকাশ করবেন। বাইরের অবয়ব এবং পৃথিবী

সম্পর্কে বোধের তারতম্য থাকে বলেই নাট্যকার-বর্ণিত চরিত্র বা পরিচালকের নির্দেশমতো অভিনেতা মিলে যেতে পারেন না।

যদিও মহান্ শিল্পীদের সম্পর্কেই এ সব কথা তবু তাঁরাই থিয়েটারে অভিনয়ের আদর্শ। এইসব ব্যক্তিস্বরূপের আবেগপ্রবাহ দর্শকের কল্পনায় গিয়ে ঠেকে এবং এইটাই নিকষ যার সাহায্যে অভিনয় তথা থিয়েটারের মূল্য নির্ধারণ সম্ভব। একটা তৃতীয় গুণের উদ্ভবের ফলে একই নাটকের একই চরিত্র দুই ভিন্ন শিল্পীর হাতে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে দর্শকের আস্বাদনের বৈচিত্র্য ঘটায়। মারিওনেট্ হলে সেটা সম্ভব হয় না ; অর্থাৎ এদিক থেকেও দর্শক বঞ্চিত হয়। এ শিল্পের পক্ষে তা হত বন্ধ্যার যন্ত্রণাস্বরূপ। এই শিল্পকে থিয়েটার থেকে নির্বাসিত করার কথা কল্পনা করা যায় না এবং অনেক পাগলের পাগলামি প্রচেষ্টাতেও এর বিনাশ নেই। ব্যক্তিত্ব, শিল্পীচিত্তের রাগাতিশয্য, অভিনয়রীতির উৎকর্ষ, স্বরসাধনার সিদ্ধি, ভাব ও ভাবের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি – এগুলিই হচ্ছে নাট্যামোদের মুখ্য সহায় এবং নটের সংবেদন ও অভিপ্রায় উক্ত রীতিতেই এসে পৌছয় পাদদীপের এপারে।

এ অপূর্ব সৃষ্টি পুতুলের দ্বারা সম্ভব নয় এ কথা বলবার আর প্রয়োজন নেই। তবু মারিওনেটের সূত্রকার অতিমেধাবী অকারী নাট্যবিশারদ গর্ডন্ ক্রেগকে স্তানিস্লাভস্কির বিশ্লেষণ ধরে বোঝবার চেষ্টা করি। স্তানিস্লাভস্কি বলেছেন যে যদিচ ক্রেগ কলের পুতুলের প্রবর্তন কামনা করেন, তবু তিনি দেখেছেন যে, অভিনেতার মধ্যে প্রতিভার সামান্যতম আভাসে গর্ডন ক্রেগ উৎসাহিত হয়ে উঠতেন। মারিওনেটের কল্পনাটা অভিনেতার প্রতিভার স্বীকৃতির পথে বাধা হয়নি কখনো। তখন তাঁর উৎসাহ, চাঞ্চল্য প্রায় ছেলেমানুষের মতো প্রকাশ হয়ে পড়ত। কিন্তু যে মুহূর্তে কোন অভিনেতার মধ্যে লেশমাত্র প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যেত না তখনি ক্রেগ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন এবং মারিওনেটের স্বপ্ন দেখতেন। স্তানিস্লাভস্কির ধারণা যে যদি প্রতিভাবান্ অভিনেতার দল – ক্রেগের নিজের তৈরি মারিওনেটের দলের বদলে তাঁর দলে সালভিনি, দুজে, য়্যারমোলোভা বা শালিয়াপিন প্রভৃতি প্রতিভাধর শিল্পী থাকতেন তবে গর্ডন ক্রেগ খুশি হয়ে কাজ করতে পারতেন।

কিন্তু মারিওনেটের স্বপ্ন আজও স্বপ্নই থেকে গেছে। যদি কোন আধুনিক কৃতকর্মা পরিচালক অভিনেতার ব্যক্তিত্বকে, মননকে নিশ্চিহ্ন করতে মারিওনেটের ভূতকে আবারো জাগাতে চান তাহলে শুধু প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় নেই, 'হে ভগবান, এ থিয়েটারের ভবিষ্যতের প্রতি তুমি দৃষ্টি রেখো।'

শ্যাম এবং কুল

অভিনেতাদের একটা বহুদিনের লালন করা গর্ববোধ 'সাজঘরে'র লেখক ইন্দ্রমিত্র নষ্ট করে দিয়েছেন। প্রমাণাভাবে বহুপ্রচলিত একটা বিশ্বাসকে অভিনয়ের ইতিহাসের পাতা থেকে গালগল্পে টেনে এনেছেন। ঐতিহাসিক অক্ষয় মৈত্র মশায় অন্ধকূপ হত্যার মতো একটা কাল্পনিক কাহিনী সম্ভাবনার অতীত বিবেচনায় ইতিহাস থেকে মুছে ফেলে তৎকালীন ইংরেজদের মুখে চুনকালি লেপে দিয়েছিলেন। আর ইন্দ্রমিত্র অভিনেতাদের মুখ চুন করে দিলেন। গল্পটা হল, 'নীলদর্পণে'র অভিনয়কালে অত্যাচারী নীলকর সাহেবের ভূমিকাভিনেতার দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটিজুতো ছুঁড়ে মারার গল্প। এই ঘটনাটা অভিনেতাদের ক্ষমতা সম্পর্কে এবং বাস্তবের বিভ্রম সৃষ্টির প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় বহন করে এসেছে এতদিন। এটা সত্য—এমন প্রমাণ না-পাওয়ায় অভিনেতাদের গর্ববোধে একটা আঘাত হেনেছে, এই দুর্ভাগ্যের পাশে আরও একটা ঘটনা সংযোজন করছি। একটা ছবির প্রকাশকালীন বিজ্ঞপ্তি। দুঃখের মধ্যে শান্তি হচ্ছে বিজ্ঞপ্তিটা থিয়েটার সংক্রান্ত নয়। সেই ছবির শ্রেষ্ঠাংশে যে সব শিল্পীরা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের নামের তালিকায় কয়েকটি মনুষ্যেতর প্রাণীর অন্তর্ভুক্তি। শুধু তাই নয় সপ্তাহান্তিক ছবির সমালোচনায় দুটি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকে "মনুষ্যেতর শিল্পীদের কাজ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখবার মত।" এবং "অভিনয়াংশে বানর, কুকুর ও ছাগলের কৃতিত্বও কম নয়।"—এ রকম লেখা হল। কেউ-কেউ আশা করেছিলেন যে ছবির মানব-শিল্পীদের কাছ থেকে এর একটা প্রতিবাদ উঠবে। কিন্তু ওঠেনি। বোধকরি সেখানে মানব-শিল্পী এবং মনুষ্যেতর জীবগণ উভয় অংশই পরিচালকের হাতে কেবলমাত্র ব্যবহৃত হয়েছেন বলেই প্রতিবাদের আবশ্যকতা বোধ হয়নি। হবেও বা।

প্রখর যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর মশায় পূর্বোক্ত কাহিনী থেকে মুক্তি পাওয়ায় অনেকে স্বস্তি পেয়েছেন। কারণ অভিনেতার ক্ষমতা সম্পর্কে যাই বলা হোক্-না কেন শিল্পকর্মের দর্শক হিসেবে (ঘটনা সত্য প্রমাণিত হলে) বিদ্যাসাগর মশায়কে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা হত।

দুটো প্রশ্ন স্বভাবতই এ কাহিনী থেকে ওঠে। আমরা অভিনয়ে কী করতে চাই এবং দর্শক কী পেতে চায়। আমরা দর্শককে অভিভূত মোহাচ্ছন্ন করতে চাই, না শিল্প-সম্ভোগ-সচেতন দর্শককে চাই। আরও কয়েকটা ইস্যু এর থেকে ওঠে—কোন দর্শকের পক্ষে এ ঘটনা ঘটান হয়ে থাকলে তিনি কি সক্রিয়-ভাবে অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন – কিংবা থিয়েটারের দর্শক হিশেবে সচেতন থেকেই অভিনেতাকে তাৎক্ষণিক পুরস্কার প্রদানের অভিনব পন্থা অনু-সরণ করেছিলেন? সক্রিয়ভাবে অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় এটা অনেক -দিন থেকে শুনে এসেছি। কিন্তু তার ফল কি দর্শক তার দর্শকসত্তাকে ভুলে নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠবে?

বাস্তবে কলকাতার সাম্প্রতিক দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রত্যক্ষ দর্শক যদি হঠাৎ দাঙ্গার উত্তেজনায় মেতে উঠে দর্শকের ভূমিকা ত্যাগ করে দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ করে, খুব বেশি আশ্চর্য নাও হতে পারি। কিন্তু থিয়েটারে দর্শকও কি তাই করবে কিংবা শিল্পের active participator 'বলতেও আমরা ঐরকম বুঝব'? পক্ষান্তরে অভিনেতাও কি অভিনয়ে নিজেকে ভুলে যাবে? –আধুনিক একটা চিন্তায় কিন্তু বলা হচ্ছে–যে মঞ্চের চরিত্রের সঙ্গে নির্বাধায় একাত্ম হওয়া এবং আবেগের ঘটনায় নিজেকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়ার ফল দর্শকের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয়–কাজেই সে কাজ থেকে বিরত থাকাই ভাল। অর্থাৎ এঁরা সমালোচক-দর্শক চাইছেন।

আজকের অভিনেতা এবং দর্শক হিশেবে আমরা বোধহয় দুটোই হতে চাই। একাত্ম এবং বিচ্ছিন্ন। শ্যাম এবং কুল নির্বাধায় বজায় রাখার পথে আয়ান ঘোষ-দের মতো কতকগুলো ভিন্নধর্মী তত্ত্বকথা এসে ভীড় করে দাঁড়ায়। –'আমরা অভি-নয়ে চোখকে ভোলাব না মনকে?' (যদিও সহজ কাজ চোখকে ভোলান।) 'মঞ্চ তো মিথ্যা–কিন্তু তাকে সত্য করে তোলাই আমাদের কাজ।' কিংবা, 'থিয়েটার বাস্তবিক নয়, কাব্যিকও নয়, –এটা হয় ভাল অথবা মন্দ, সত্য কিংবা মিথ্যে।'

সব তর্কের শেষ কথা হিশেবে যদি শেষোক্ত উক্তিকে মেনে নিই তাহলে সৎ-নাট্য এবং নাট্যসত্য কথাদুটোকে গুরুত্ব দিতে হয়। এবং আরও অনেক তর্কের সীমান্তে যদি এই সিদ্ধান্তে আসা হয় যে নাট্য মানেই নটের অভিনয়–তাহলে সৎ অভিনয় কী? শ্যাম এবং কূল রাখার দ্বৈত প্রক্রিয়ার কথা স্বভাবতই মনে আসে। প্রায় প্রত্যেক থিয়েটারে কি এই বিচারণ বর্তমান নয়?

নাট্যক্রিয়া প্রায় তাঁতের মাকুর মতো একবার রিয়্যালিটিকে ছুঁয়ে যায় আর-

বার থিয়েটারকে। থিয়েটার বলতে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই বোঝাচ্ছে। একই সঙ্গে অভিনয়ানুষ্ঠান বাস্তব এবং থিয়েটার। ক্ষণেই বাস্তব-জীবনের ওপর আলোক-পাত করে (অর্থাৎ বাস্তবের বিভ্রম তৈরি করে) পরমুহূর্তেই থিয়েট্রিক্যাল এফেক্ট সৃষ্টি করা সম্ভব – যা, আমরা জানি, থিয়েটার : বাস্তব জীবন নয়। নাটক দেখতে-দেখতে এমন ক্ষণ নিশ্চয়ই আমাদের অভিজ্ঞতায় জমা আছে। এ ব্যাপারে প্রচলিত উদাহরণ হল ঘড়ির সময় এবং নাটকের সময়। এক যুগ – এক লহমা থিয়েটারে অতিক্রান্ত হতে পারে। আমরা বিশ্বাসও করি, থিয়েটারও মানি।

'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়ে জয়সিংহ যখন আত্মহননের উদ্দেশ্যে বুকে ছুরি বসিয়ে দেয় তখন আমরা জয়সিংহের মৃত্যুতে গভীর বেদনা বোধ করি, প্রত্য-ক্ষণের (বা রিয়্যালিটির) তাড়ায় আমরা মঞ্চে ছুটে যাই না জয়সিংহের বুকের ছুরি বের করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার জন্যে। অথবা তৃপ্তি মিত্র যখন 'পুতুলখেলা' নাটকে বুলুর ভূমিকায় অভিনয়ের সময় কেষ্টপদর চিঠিটা স্বামীর হাতে যাতে না পড়ে তার জন্ম ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, তখন আমরা তাঁর সঙ্গে উদ্বেগ বোধ করলেও থিয়েটার ভেবেই ঘটনাকে গড়াতে দিই শেষ পর্যন্ত – কিন্তু চাবির থোকা ছুঁড়ে দিই না, সমস্যাটা বাস্তব বিবেচনায়। আমরা 'বুলু' এবং 'জয়সিংহে'র সঙ্গে সম-ব্যথী হই – যেন তারা খুব বাস্তব আমাদের কাছে, আবার এ-ও বুঝি যে আমি প্রেক্ষাগৃহে বসে থিয়েটার দেখছি। স্যামুয়েল জনসনের কথাটাই বিশ্বাস করা ভাল : 'দর্শক সকল সময়েই সচেতন, প্রথম অঙ্ক থেকে শেষ অঙ্ক পর্যন্ত সে জানে যে মঞ্চটা মঞ্চই এবং অভিনেতারা অভিনেতাই।' তারা অভিনেতার সঙ্গে নিজেকে চিহ্নিত করেও তৃপ্ত হয় (এটা vicarious তৃপ্তি), আবার অভিনেতার অভিনয় দেখেও খুশি হয়।

মোপাসাঁর কিছু গল্প সম্পর্কে সমালোচক বলেন যে, "প্রত্যেকটা বিস্তারিত ঘটনা অত্যন্ত বাস্তব কিন্তু সম্পূর্ণতায় সেটা ফ্যান্টাস্টিক।" সৎ-নাট্যও বোধহয় অত্যন্ত বাস্তব কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে সেটা থিয়েটারীও। কাছাকাছি একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। অভিনয় সম্পর্কে নয়, মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে। 'অঙ্গার' নাটকের কোলিয়ারী পিটের দৃশ্যসজ্জা উল্লেখ করছি। অদ্ভুত। দৃশ্য উন্মোচনে প্রথম প্রতি-ক্রিয়া : অত্যন্ত স্বাভাবিক – প্রখর বাস্তব। সময় অতিবাহিত হলে তখন কাঠ-কুটো, লোহা, আলোছায়ার অস্তিত্ব এবং মঞ্চের মধ্যে তৈরি দৃশ্য যে একটা থিয়েটারের চমৎকার সেট্ সেটা প্রতীয়মান হল ; আদিতে একটা প্রকৃত কোলি-য়ারী পিটের ইল্যুশান এবং বিশ্বাস উৎপাদন, অন্তে আমরা অনুভব করি যে সেটা

দৃশ্যসজ্জা। বাস্তব নয়, থিয়েটার। অভিনয়ের ক্ষেত্রে এটা বাঞ্ছনীয় হলেও সেটা সহজ নয় বলাই বাহুল্য। এর কোন সাধারণ রাসায়নিক নিয়মও নেই যে কতটা থিয়েটারি আর কতটা বাস্তব মিলবে। তাই 'অভিনয় ন্যাচারাল হবে' বা 'রিয়ালিটিকে প্রকাশ করতে হবে' নির্দেশে অভ্যস্ত মনে ধাক্কা লাগল, যখন শোনা গেল নির্দেশক বলছেন ঘটনাটাকে 'থিয়েট্রিক্যালি কীভাবে সত্য করে তুলবে'! বড্ড গোলমেলে ব্যাপার।

'থিয়েটারি বাস্তব' বা 'বাস্তবিক থিয়েটার' এ কথাদুটো লেখাতে জুড়ে দিয়ে না-হয় সহজে সিন্থেসিস্ করা গেল—বা দর্শক তার স্বাভাবিক ক্ষমতাবলে থিয়েটারের প্রথা এবং বাস্তবের বিভ্রমের মধ্যে সহজে বিচরণে সক্ষম হতে পারল —কিন্তু অভিনেতা? চরিত্রগুলো যেহেতু মানুষ, তখন মানুষের ইল্যুশন্ সে সৃষ্টি করতে পারবেই। সে মুখোশ পরেই হোক্ কিংবা বিনা মুখোশেই হোক্। মঞ্চে দাঁড়িয়েই হোক্ বা যাত্রার আসরে হ্যাজাক্ বাতির নিচেই হোক্। দুটো ক্ষমতা তো তার আছেই : দেহধারী আস্ত মানুষ সে, হেঁটে চলে বেড়াতেও পারে, অঙ্গভঙ্গিও করতে পারে। পোশাকের বা অন্য কোন স্টাইলের আবরণে সে চাপা পড়বে না, আর দ্বিতীয়ত, তার গলা দিয়ে যে আওয়াজ বেরোয় সেটাও অত্যন্ত বাস্তব। কর্ণকুহরে তা প্রবেশ করবেই। কাজেই অন্য যে-কোন শিল্পক্ষেত্রের তুলনায় স্বাভাবিকতা এবং বাস্তবতা কথাদুটো অনেক বেশি সার্থক থিয়েটারের ক্ষেত্রে। কোন চিত্রশিল্পী একটি স-শিষ রজনীগন্ধা আঁকতে বাস্তবের হুবহু অনুকরণ করলেও আস্ত রজনীগন্ধা দিয়ে ক্যানভাস্‌কে পূর্ণ করতে সক্ষম নন। আর থিয়েটারে মানবচরিত্রের ভূমিকাভিনেতা স্বয়ং মানবসন্তান। রং-তুলি দিয়ে আঁকা নয়। কিন্তু নয় বলেই তা কঠিন এবং জটিলও বটে। কঠিন এবং জটিল এই কারণে যে বাস্তবতার বিভ্রমটাই এক্ষেত্রে শেষ কথা নয়। শেষ কথা হল থিয়েটার। 'কনফাউণ্ডেড ফিলজফি' নয় 'এ্যাক্শন্'ই সার কথা যেমন, তেমনি থিয়েটারের স্টাইলই বড় কথা। এই স্টাইল থিয়েটারে বাস্তবের বিভ্রম সৃষ্টির প্রথা থেকেই উদ্ভূত। তাই বাস্তব বা স্বভাব কথাগুলোর আগে 'নাট্যীয়' এই বিশেষণ বিভূষিত করতে হয়। অর্থাৎ থিয়েটারে কোন অভিজ্ঞতাই বাস্তব নয় যদি তা মুখ্যত থিয়েটারি না হয়। অভিনয়ে এই থিয়েটারি বাস্তব যত বেশি প্রকট হবে বাস্তবের বিভ্রমও ততই প্রখর হবে।

একটা বিশ্বাসযোগ্য চরিত্রসৃষ্টির কথা আমরা এতদিন শুনে এসেছি—এখন এর সঙ্গে আরও একটা দায়িত্ব এসে চাপল যে একে থিয়েটারিও করতে হবে।

অথচ 'থিয়েট্রিক্যাল' বা 'থিয়েটারি' এই কথাদুটো শুনলেই আধুনিক নাট্য-কর্মীদের মনে একটা দ্বিধা এসে দেখা দেয়—রিয়ালিস্টিক হওয়ার পথে বাধা বিবেচনায়। একটা কারণ বোধহয়, আমরা থিয়েট্রিক্যাল কনভেনশন্ বলতে একটা অনড় প্রথা মনে করি। ইতিহাস কিন্তু বলছে যে সর্বকালের সৎ-নাট্যাভিনয় সেইকালে রিয়ালিস্টিক। গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় বাস্তবতা নিশ্চিত করেই শিশিরকুমারের থিয়েটারের বাস্তববোধের সঙ্গে মিলতে পারে না। সেই যে কবেকার সেইকালে এথেন্সের নাট্যানুষ্ঠানে মুখোশধারী অভিনেতারা চরিত্র সৃষ্টি করার স্টাইল অনুসরণ করত তা সেইকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বলেই তা তখন মিথ্যে হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু পরবর্তী পরিবর্তিত সমাজে এবং মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালীতে তা আর অনুসরণ করা হয়নি। অভিনেতা গ্যারিক তাঁর সমসাময়িককালে অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিনয়ের জন্য খ্যাতি পেয়েছিলেন, তা পরবর্তীকালের রিয়ালিটিবোধের সঙ্গে তুল্যমূল্য হয়নি। আজকের দর্শকের কাছে হয় তা মূল্যহীন না-হয় অস্বাভাবিক থিয়েট্রিক্যাল। আজকের দিনের থিয়েট্রিক্যাল কনভেনশন্ যত বেশি আজকের দিনকে প্রকাশ করবে চরিত্রও তত বেশি রিয়াল হবে। এই স্টাইল স্বভাবতই আমাদের আজকের সমাজ, আজকের জীবনধারা এবং অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ হতে পারে না।

'দশচক্রে' ডাঃ পূর্ণেন্দু গুহর ভূমিকায় শম্ভু মিত্রের অভিনয় এই প্রসঙ্গে স্মরণ করছি। ১৯৫২ সালে তিনি এই নাটক প্রথম করেন। তখন তাঁর অভিনীত ডাঃ গুহ অত্যাশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছিল। সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সেটা একটা মহৎ চরিত্রায়ণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ১৯৬২ সালে নবপর্যায়ে রূপায়িত সেই একই চরিত্র আরও বেশি থিয়েট্রিক্যালি বাস্তব। নাটকীয় সত্য যদি অনড় হত তাহলে থিয়েটারি প্রকাশটাও এক জায়গায় থাকত। কিন্তু সেটা যেহেতু শুধুমাত্র শিল্পীর উন্নততর শিল্পবোধেই নির্ভরশীল নয়, নতুন স্টাইল বা আজকের সমাজ এবং জীবনযাত্রার সঙ্গেও যুক্ত, তাই এই নৈপুণ্য উন্নততর তথা, আরও বাস্তব করে তুলছে। ১৯৫২ সালের সামাজিক অবস্থা আজকের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মেলে না। ১৯৫২ সালে সমাজের তথাকথিত জনদরদী নেতাদের মুখোশ এতটা উন্মোচিত হয়নি অথচ এই চরিত্রের চারপাশে সেইসব চরিত্রই নাট্য-ঘটনার জন্য মুখ্যত দায়ী, আজ যাদের মুখোশ খুলে গেছে, তাই ডাঃ গুহের থিয়েটারি চরিত্র আরও বেশি রিয়াল দর্শকের কাছে এবং চরিত্রাভিনয়ও অনেক বেশি বলিষ্ঠ। আমার ব্যক্তিগত মত অবশ্য এটা।

যেটা বলতে চাইছি সেটা হল, আজকের নাটকীয়তার প্রকাশ আজকের জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত। তাই পুরোনো প্রকাশরীতি সকল সময়ে অনুকরণীয় নয়। সমাজের রীতিনীতি এক জায়গায় থেমে থাকলে এ সব সমস্যাই থাকত না। মুখোশ পরে কিংবা শুধু প্যান্টোমাইম্ করে সহজেই অভিনয় করা যেত আজও, বা বিশ্বাসও উৎপাদন করা যেত। কিন্তু সেটাও থিয়েটার, আজকের এটাও থিয়েটার।

আজকের দিনের থিয়েট্রিক্যাল কন্‌ভেন্‌শন্ কী হবে—এই প্রশ্নের ওপরই পুরো নাট্যানুষ্ঠানের সং-রীতি নির্ভর করছে। একটা বিশ্বাসযোগ্য চরিত্ররূপায়ণের সঙ্গে থিয়েটারি সত্যকে ভাবে-ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে পারার মধ্যে কি কোন বিরোধ আছে? স্তানিস্লাভস্কি-শিষ্য ভাগ্‌তানগভের নির্দেশ: চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য এবং একই সঙ্গে থিয়েটারি করা তাঁর বক্তব্য, তিনি গুরুর বাক্য অলঙ্ঘিত রেখেই 'তা করতে চেষ্টা করবেন। তাঁর বিশ্বাস লোকে স্তানিস্লাভস্কিকে ভুল বোঝেন। তাঁর সিস্টেমের প্রথম কথাটা, "That the actor should not be concerned about his feeling during a play." লোকে ভুল ব্যাখ্যা করে, ফীলিং আপনিই আসবে। 'কে আমি, কীরূপ আমি, এবং আমি কী করতে চাই'—এইটিই আসল কথা।

ফীলিং বা অনুভবটা থিয়েটারে বা বাস্তবে দুই ক্ষেত্রেই এক এবং অভিন্ন। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমার শোক দুঃখ প্রেম ভালবাসা রাগ দ্বেষ যেভাবে প্রকাশ করব তার রূপ কি থিয়েটারেও ঠিক একই থাকবে, না প্রকাশের পদ্ধতি বা স্টাইলে তা ভিন্ন হবে?

'পুতুলখেলা'র বুলু যে তার স্বামীকে ভালবাসে সেটা স্টেজের ভালবাসা, না সত্যি ভালবাসা, 'চার অধ্যায়ে'র এলা যে বটুকে ঘৃণা করে সেটা কি মঞ্চের ঘৃণা না সত্যি ঘৃণা। কিংবা এ-দুয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, তফাৎ শুধু থিয়েটারের সঙ্গে যোগ রেখে প্রকাশ করায়। এইটাই কি চাইছেন নির্দেশক থিয়েট্রিক্যালি সত্যি করে তোলার কথায়?

যদি কেবলমাত্র বাস্তব জীবনের আয়নায় প্রতিফলনই থিয়েটার হত তবে তফাৎ হত না প্রকাশে। কিন্তু যখন Hardy-র কবিতার মতো কোন বাস্তব চরিত্র, দর্শকের আসনে বসে বলে:

"I hate my beauty in the glass!
My beauty is not I."

তখন? তাই অভিনেতা হিসেবে দুটো ব্যাপারে মনোযোগ রাখতে হয়: এক

মানুষ হিশেবে রিয়ালিটিকে বোঝা এবং দুই, শিল্পের স্টাইলকে বোঝা। এ কথাটা যেমন সত্য যে আমাকে যখন অভিনয় করতে হবে তখন আমি-হেন বাস্তবকে দিয়েই শুরু করতে হবে। আমাকেই নাট্যচরিত্রের সঙ্গে উঠতে হবে, বসতে হবে, হাসতে হবে, কাঁদতে হবে। কাজেই 'to create & not to be oneself' এ তো হয় না। আবার এ-ও সত্য যে থিয়েটারের নিজস্বতার মধ্যেই আমাকে প্রকাশ করতে হবে—যেটাকে থিয়েটারের স্টাইল বলা হচ্ছে।

'পুতুলখেলা'র অভিনয়ে বহুদিন শোনা গেছে যে দর্শক অভিভূত হয়ে যায় এবং ভাবে যে তারা কোন বাড়ির ভেতরকার স্বামী-স্ত্রীর ঘটনাগুলো চুরি করে দেখে ফেলেছে, এতই স্বাভাবিক। অর্থাৎ চতুর্থ দেওয়ালের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন তাঁরা এবং সেটার সঠিক প্রযুক্তিও হয়েছে তাহলে। কিন্তু তৃপ্তি মিত্রের 'বুলু' কি কেবলমাত্র বাস্তবের বিভ্রমটাই সৃষ্টি করেছিল—না থিয়েটারের অভিজ্ঞতারও অনুরণন তুলেছিল, যার দ্বারা দর্শক চরিত্রটির বাঁচা ভালবাসা কষ্টটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল? যেটাকে আমরা স্বাভাবিক অভিনয় বলছি তার চূড়ান্ত প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও 'বুলু' একটা 'চরিত্র' এবং অভিনেত্রী 'তৃপ্তি মিত্র'ও—যে অভিনেত্রী তাঁর অভিনয়ে ছন্দ যতি ঝোঁকে ভঙ্গিতে বাচনে থিয়েট্রিক্যাল স্টাইলের অনুসরণ করেছেন। এই বিচারণেই অভিনয় সার্থক। এ কথা আজও যেমন সত্য—মুখোশধারী গ্রীক নায়কের ক্ষেত্রে এবং কমেদিয়া দেলার্তের হার্লেকীনের ক্ষেত্রেও সমভাবে সত্য। তাই থিয়েটারে অভিনয় স্বাভাবিক কিংবা বাস্তবিক না বলে থিয়েট্রিক্যাল-স্বাভাবিক বা বাস্তবিক বলা উচিত। কিন্তু এই ঔচিত্যবোধেই সমস্যার সমাধান হল না।

আমরা শুনেছি অভিনেতার চরিত্রের মধ্যে জীবন দান করতে হবে নইলে সে নাট্যকারের সংলাপের ভারবাহী হিশেবে প্রমাণ করবে নিজেকে। এইখানেই কল্পনার কথা ওঠে—স্তানিস্লাভস্কির বিখ্যাত 'If' বা 'যদি'র কথাও ওঠে। এই কল্পনার কথা উঠলেই কিন্তু বাস্তবের হুবহু অনুকরণের থেকে শিল্পীর দূরে যাবার স্বাধীনতাও মেনে নেওয়া হল। এবং এই কল্পনার সাহায্যেই সে সৃষ্টি করবে মঞ্চের ওপর। নাট্যকার সর্ব অবস্থার সংলাপ কোন নাটকেই যোগান দেন না। সে শেক্সপীয়রও না রবীন্দ্রনাথও নন। ধরুন 'রক্তকরবী'র রাজা যখন ভেতর থেকে কথা বলে যাচ্ছে তখন নন্দিনী এবং বিশু চাতালে দাঁড়িয়ে কী করবে বা ভাববে সে কথা লেখা নেই নাটকে।

অভিনেতা নন এমন কাউকে জিজ্ঞেস করলে এদের থিয়েট্রিক্যাল ক্রিয়া সম্পর্কে

কোন সদুত্তর দিতে পারবেন না, বড়জোর বলবেন, 'শুনবে এরা দাঁড়িয়ে রাজার কথা।' অভিনেতার কাছে এইটুকুই যথেষ্ট নয়। আপন অন্তরে সে যেমন প্রবেশ করবে তেমনি সেটা থিয়েট্রিক্যালি প্রকাশও করতে হয় দর্শকের কাছে। 'চতুর্থ-দেওয়ালে'র কথা ভেবে দর্শক সম্পর্কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখালে চলে না তার। শুধু তাই নয়, রাজার কথায় নন্দিনীর কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেটাও বিশুকে বুঝতে হয় এবং সে যে বুঝতে পারছে সেটাও দর্শককে জানানর দায় তার। বাস্তব জীবনে তার এই জানানর দায় নেই।

এই প্রসঙ্গে ব্রেখট্ এবং স্তানিস্লাভস্কির কথা বারে-বারে উঠছে। কারণ আধুনিক নাট্যভাবনার মধ্যে এই দুই ব্যক্তি অনেকখানি স্থান জুড়ে আছেন। নতুন অভিনয়-ধারা তৈরি করতে এঁদের কথা স্বভাবতই আসবে। স্তানিস্লাভস্কি চাইছেন অভিনেতা একটা চরিত্র সৃষ্টি করুক। শুধুমাত্র বাহ্যিক চরিত্র লক্ষণ নয়, তার অন্তর জীবনেরও উদ্ঘাটন হোক্ মঞ্চে। এবং মঞ্চে এইভাবে কেবলমাত্র চরিত্র সৃষ্টি করতে তিনি নিজে অনেকখানি পরীক্ষা করে সফল হয়েছেন এবং চরিত্রের অনেকগুলি থিয়েটারি প্রকাশপদ্ধতিকে পরিহার করেছিলেন; যেমন, তাঁর পূর্বে অভিনীত ডাঃ স্টক্‌মান্ চরিত্রটা প্রকাশ করতে এক বিশেষ ধরনের হাঁটা, চোখে কম দেখা, কথা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব ইত্যাদি করতেন। কিন্তু *Hedda Gabler*-এ লভবর্গ-এর সময় এইরকম বাহ্যিক কোন চারিত্রিক লক্ষণ প্রকাশের চেষ্টা করেননি। একজন সমালোচক 'সে অভিনয় প্রসঙ্গে বলেছেন, "His make-up seemed to come from inside." এই প্রসঙ্গে ব্রেখট্ আবার উল্টো কথা বলছেন, "The actor on the stage will not identify completely with the character.... He is not Lear, Harpagon, Schweik – he shows them." মহৎ শিল্পীর কাজ বা মহতের উক্তিতে আমরা বিরোধের বীজ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের করণীয়টা কী হবে?

শুধু চরিত্র হয়ে বাঁচতে চাই না মঞ্চে, অভিনেতা হতেও চাই এ-ও যেমন সত্য তেমনি শুধু থিয়েটারের অভিনেতা হয়ে নয়, এক-একটা চরিত্র হয়েও বাঁচতে চাই। 'মুক্তধারা'য় শম্ভু মিত্র ছোট্ট একটা ভূমিকায় কয়েকদিন অভিনয় করতেন। লঘু চরিত্র। এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে উৎপল দত্ত ভক্তপ্রসাদের অভিনয় করেছেন। সাহিত্যে অনেক বড় চরিত্রের পাশে যেমন ভাঁড়ু দত্ত, ফলস্টাফ্ সত্য হয়ে আছে— অস্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও, অনেক স্টাইলাইজড্ হওয়া সত্ত্বেও তেমনি এ চরিত্রদুটি রিয়াল। কমিক চরিত্রের প্রকাশেও এই রিয়া-

লিটি প্রকাশ পায় স্টাইলের সংমিশ্রণে। থিয়েটারে তারা অনেক সত্য হয়ে থাকে। সমস্যাটা যাবারি ক্ষমতার অভিনেতাদের কাছেই বেশি। তারা ভাবে, তারা সত্য হতে পারে স্টাইল ব্যতিরেকে এবং অপরপক্ষে, স্টাইল প্রকাশে সক্ষম তারা রিয়ালিটিকে বাদ দিয়ে।

যদি সহজ করে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, রিয়ালিজম্-এ চরিত্রের উপস্থিতি বা প্রেজেনস্‌কে প্রকট করে—সারবস্তুকে (থিয়েটারের) নয় এবং পক্ষান্তরে রিয়ালিজম্-এর বিরুদ্ধবাদীরা কেবলমাত্র সারবস্তুতেই সন্তুষ্ট—উপস্থিতি চান না, তাহলে ইতিকর্তব্যে সমীকরণের কথাটাই উঠবে। অভিনয়টা কন্‌ফাউণ্ডেড্ ফিলজফি বা সাইকলজির পর্যায়েও নয়, ওভার-মোটিভেশনও নয়, আবার থিয়েট্রিক্যালিজম্-এর বাড়াবাড়ি প্রকাশও নয়। চরিত্র-উদ্ভবের আশায় রূপসজ্জা ইত্যাদি থিয়েটারি বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়েও না, বা থিয়েটারকে থিয়েটার বোঝাতে মঞ্চের ওপর সাজ-পোশাক পরা বা ছাড়াও নয়।

নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে নানারকম তত্ত্বকথার প্রয়োগ এখানে চালু হয়েছে। অভিনয়ের নতুন ডায়মেন্‌শনের কথাও সেই সূত্রেই আসছে—এবং এক নতুন বাক্‌ধারার প্রবর্তনের কথাও আসছে। সেই সূত্রেই এ আলোচনা; কী সেই অভিনয়রীতি যা আমরা খুঁজছি? এখনও যে খোঁজার শেষ হয়নি।

ব্রেখ্‌ট্ আর স্তানিস্লাভস্কির মধ্যে বিরোধটা কোথায়? ব্রেখ্‌ট্‌কে বোধহয় ভুল বোঝা হবে যদি ভাবা হয় যে তিনি তাঁর প্রবর্তিত অভিনয়-শৈলীতে চরিত্র রূপায়ণের কথা বলেননি। ব্রেখ্‌ট্ ধরে নিয়েছেন যে তাঁর অভিনয়শিল্পীরা চরিত্র সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং তারা একটা ভূমিকায় সম্পূর্ণ ডুবেও যেতে পারে। এ পর্যন্ত তিনি স্তানিস্লাভস্কির সঙ্গে একমত। কিন্তু এর পরের ধাপ হিশেবে তাঁর পরীক্ষায় তিনি অভিনেতাকে শেখাতে চান যে কীভাবে ভূমিকার বাইরে আসতে হয় অর্থাৎ অভিনেতা তখন কেবলমাত্র সাবজেক্ট নয়।

ভূমিকার বাইরে আসার কথা তখনই উঠতে পারে যখন ভূমিকায় সাযুজ্য লাভ ঘটেছে। 'ইল্যুশন্ ভাঙবার' কথার কোনও মানে হয় না যদি তা আদৌ তৈরি না হয়। আবেগকে ঠেকাবার সাবধানতার কথাও অর্থহীন যদি কেউ আবেগ সৃষ্টি করতেই অক্ষম হয়।

আমরা দর্শককে ঠকাব, ভোলাব, না বোঝাব যে অভিনয়টা শিল্প?

অভিনেতার সমস্যা

সমস্যা তো একটাই। আমার, আপনার, সকলের। বাঁচার ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টাতেই শেষ শ্বাস নিঃশেষিত। বাদুড়ঝোলা ট্রামে-বাসে, বাজারে, আপিসে, আদালতে সমস্যা, অন্ধ অলিতে-গলিতে অজানা অন্ধকারের আতঙ্ক। নিরঙ্কুশ হঠকারিতার সামনে আপনার নপুংসক আত্মসমর্পণের সমস্যা—আবার অতি সাহসীদের প্রশ্ন আর যুক্তির সমস্যা। সব সমস্যার সঙ্গেই যুক্ত কিন্তু আমার, আপনার অস্তিত্বের সমস্যা।

কিন্তু বদ্ধ উন্মাদদের সমস্যা আছে? উন্মাদদের কাণ্ডকারখানা বলেই না পঁচিশ বছরের থিয়েটারের ঢেউটা আজও ঝিকিমিকি করছে। পাগল না হলে কি এই অবস্থায় আজও অভিনয়ের আসর বসে? দিনমানে, এখানে-ওখানে, তেল-নুন-ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করেই ক্লান্ত বলদের মতো ধুঁকতে-ধুঁকতে, ছুটতে-ছুটতে, দলে এসে জোটপাট করে সন্ধেবেলায় নাটকের মহলা চালাচ্ছে! উন্মাদ ছাড়া সম্ভব! তাদের সমস্যা নিয়ে কী হবে বলুন? খোঁচা দিয়ে ঘা করে কী লাভ? বেফাঁস যদি পাগলের বকবকানি শুরু হয়, ফিরিস্তি দিতে থাকে সমস্যার? তখন আর-এক সমস্যার ফেরে পড়তে হবে অন্য সকলকে। সেটা কি ভাল দেখাবে? কেন আজও বেদের পুঁটুলি নিয়ে যাযাবরের মতো এই নাটুকে দল-গুলোকে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে? কেন সাদা চোখে নাচতে-নাচতে হঠাৎ সূর্মা টেনে ছলাকলা করতে হচ্ছে কাউকে-কাউকে?

তাই কী দরকার এসব সমস্যা উঠিয়ে? একটা কথা নিশ্চয়ই পরিষ্কার যে, বাঁচার সমস্যাটা নেটোদের কিছু আলাদা নয়। রঙ্‌চঙ্‌ মেখে রাজা সাজলেও যা, আর ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে ভিখিরী সাজলেও বাইরের বাঁচার সমস্যাটা একই। অন্য যে কথাগুলো এর আগে লেখা হল সেটা আশা করা যাক্‌, একদিন-না-এক-দিন সমাধান হবেই। তখন বাইরের বাঁচার স্বস্তি নিয়ে কি এই পাগলদের সমস্যা মিটে যাবে? ভেতরের বাঁচার ছটফটানি তো তার থেকেই যাবে। বরং সেই আলোচনাই করা যাক্‌।

কী দরকার ছিল বলুন তো ? আমি এক আছি—বহু হব—সাধের ? বেশ তো স্থাকা ছেলের দিনাতিপাতের মতো অন্য আর-পাঁচজনের মতো কাটিয়ে দেওয়া যেত রকে দাঁড়িয়ে, পাশের বাড়ির মেয়ের দিকে চেয়ে-চেয়ে। কিংবা ছেলে-বৌ নিয়ে সপ্তাহান্তে সিনেমা দেখে, অবসর সময়ে তাস-দাবা খেলে, পরচর্চা করে, মুখে হাতি মেরে, গণ্ডার মেরে কাটিয়ে দেওয়া যেত। তা নয়, বহুভাবে, বহুতর রূপে বাঁচব ! কী স্পর্দ্ধা বলুন ; বড়-বড় নেতারাই বাঁচতে পারছেন না—আজ আছেন কাল নেই। আর মরে গেলে ত চুকেই গেল—বড় জোর একদিন বন্ধ ! নেটোর আকাঙ্ক্ষা আবার আকাশছোঁয়া। জানে না তো এই টুক্‌রো কালের মধ্যেই তার সব খেলার সীন। তুই তো বাবা ভ্যানগ নস, কিংবা রোটেন্‌স্টাইন নস যে তোর ছবি বা মূর্তি দুশো, পাঁচশো বছর পরেও তারিফ পাবে ! তোর তো বাবা দেহপট সনে সকলি হারাবে। তাইতো তোকে আজকের মধ্যে বেঁচে উঠে, বেঁচে থেকে নগদ বিদায় নিয়ে বিদেয় নিতে হবে। এটা যে জানে না সে তা নয়, তাই নগদ বিদায় পেতে তার কত কসরৎ, কত মেহনত। দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, লোকপ্রিয় হতে হবে। অবশ্য শিল্পী মাত্রই তো চান তাঁর দুঃখ-বেদনা, আনন্দ, চিন্তা, অনুভব সকলের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে ভোগ করতে—তার আসল বাঁচা নাকি এইভাবেই। চারপাশের নানা ঘটনার যে ছাপটা তার মনে পড়ছে তাকে ধারণ করে—তার থেকে যে বুজকুড়ি উঠছে তাকে ছড়িয়ে দেওয়া পাঁচজনের মধ্যে, এ কাজ তো সহজ নয় ! অথচ ঐ যে বললুম, অল্প কয়েকটা বছরই তার নাচন-কোঁদন, সব কীর্তির শেষ। তাই, স্টাণ্ট মেরে, প্যাঁচ দেখিয়ে, মুদ্রা-দোষ ভাঙিয়ে অথবা স্লোগান আউড়ে বাজী মাৎ কর। অভিনেতা হিসেবে আসল বাঁচাটার বুকে ছুরি চালাও। আর এই ব্যাপারে বোধ-বুদ্ধির দুয়োরে তালা লাগাতে সাহায্য করে মানে-না-হোক্ মজা-খোঁজা দর্শক। এই স্তাখ, আবার দর্শককে টানাটানি করা কেন ! দর্শক তো লক্ষ্মী !

অভিনেতার আসল বাঁচার কথাটায় ফিরে আসা যাক্। বলা হল 'নিজের আত্মার কাছে সৎ হতে হবে'। আবার আত্মাটাত্মা এ সব আধ্যাত্মিক কথাবার্তা কেন ? আত্মার বুকে তো ছুরি চালান হয়ে গেছে। অভিনেতা বললেন, না, আমার আত্মা এখনও উঁকিঝুঁকি মারছে। তাই যদি মারছে তবে সমস্যাটা কি ! সে বললে—সমস্যা হল কোন্ পথে আমি চরিত্রটা হব, তাতে বাঁচব ! এক-একজন, এক-এক পথ ধরে, দিব্যি লোকপ্রিয় হচ্ছে—সে কোন্ পথটা ধরবে ? ঐ যে ভেতরকার বুজকুড়ি, যাকে অনুভূতি বলা হয়েছে, তার সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে

যান্ত্রিক অভিনয়ে সে দর্শককে আপ্লুত হতে দেখেছে ; দেখেছে রবার স্ট্যাম্প-মারা অভিনয়েও দর্শক সাড়া দিচ্ছে।—তা ভাবনাটা হল দর্শকের জন্যেই তো অভিনয়—তাকে তো তুষ্ট করতেই হবে ! আহা, দর্শক যদি অভিনয়ের মানোন্নয়নের দিকে অভিনেতাকে উৎসাহিত করত—তবে বেশ হত। তা কি হয়—তাই নিজেকে সহজভাবে কী করে প্রচার করা যায় ? ছকে বাঁধা পদ্ধতির অনুশীলনই তো বেশ সহজ পন্থা।

অভিনেতা দর্শককে ঠকাবে, না ভোলাবে, না চরিত্রের মধ্যে জ্যান্ত হয়ে উঠবে ? এই পাঁচ রকম টানাপোড়েনের মধ্যে টলমল করেই অভিনেতাকে হাঁটতে হয়। সার্কাসের দলে তারের ওপর নাচিয়ে-মেয়েটির তবু একটা স্থির লক্ষ্য থাকে, হাতে থাকে টাল সামলাবার ছাতাটা। তার লক্ষ্যটা স্থির বলেই সে যখন এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছয় তখন দর্শক-অভিনন্দন কুড়োয়। তারের ওপর স্ট্রিপ্ টিজ্-এর খেল দেখিয়ে হাততালি পেতে হয় না।

কিন্তু অভিনেতাকে বিভ্রান্ত করতে যে সামনে অনেকগুলো তাঁতের টানা সুতোর মতো পথ প্রসারিত। 'আমরা অভিনয়ে চোখকে ভোলাব না মনকে ?' (যদিও সবাই জানেন চোখ ভোলানই সহজ।) কিংবা 'মঞ্চ তো মিথ্যা—তাকে সত্য করে তোলাই আমাদের কাজ'—অথবা 'থিয়েটার বাস্তবিকও নয়, কাব্যিকও নয়, এটা হয় ভাল অথবা মন্দ, সত্য কিংবা মিথ্যা', চরিত্রের সাযুজ্যে প্রাণ বিসর্জন দেব না চরিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব ? কোন্ পথটা সে ধরবে !

আসল সমস্যাটা তো 'হওয়া'র—'হয়ে ওঠা'র।

নির্দেশক বললেন, তুমি চরিত্রটার মধ্যে বেঁচে ওঠ। চরিত্রটা হও। হবে কী করে ? যাকে বলা হয়েছে আবেগ সেটা সকলকে জানাবার যন্ত্রটা ঠিক আছে তো ? অর্থাৎ তার কণ্ঠস্বর আর দেহ। অবচেতন মনে অনুভবের যে বীজটা বপন করা হয়েছে, সচেতন স্তরে তার ফল ফলাবার কৌশলটা আয়ত্তে তো ? সমস্যাটা এইখানেই। আপসে-আপ্ পাওয়া ক্ষমতা আর দেহ-গরিমার গৌরব একসঙ্গে ক'টা অভিনেতার ভাগ্যে জোটে বলুন ? সেটা যেমন বিরল, তেমনি অনুশীলনের যোগ্য জায়গাও তো অপ্রতুল। তাই অভিনেতা ইন্‌টুইশনের ওপর নির্ভর করে থাকে। আবেগ আপনিই বেরুবে এই কথা সে ভাবে এবং পরিণামে সকালবেলায় টুথপেস্ট টিপে বের করার মতো আবেগ বের করতে হয়, গলার শির ফোলাতে হয়, বেশি-বেশি করার দিকে ঝোঁক দিতে হয়। ইন্‌টুইশনকে পোষ মানাতে পারলে বেশ, কিন্তু পোষ না মানলে নির্ঘাত বে-লাইনে চালান

করে দেয়।

আজকের থিয়েটারের স্বরূপ কী? যদি এটাকে তিলোত্তমা শিল্প বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে মানতেই হবে সবাই মিলে একটা একাত্মবোধ থেকে এর জন্ম এবং এ নাট্যরীতির মূল গায়েন অভিনেতা। অভিনেতা যে পেশাদার বক্তৃতা-বাজ নয়, লোকাল ট্রেনের ফিরিওয়ালা নয়, এটা ভুলে গেলে ধরিয়ে দেবেন নির্দে-শক। তিনি এই কো-অপারেটিভ সোসাইটির কর্ণধার। এটা অবশ্যই একটা আইডিয়াল অবস্থা ভাবা হচ্ছে। নির্দেশক তো আর্কিটেক্ট। তাঁর কল্পনায় পুরো বাড়িটার নক্‌শা রয়েছে। একটু-একটু করে তিনি এগুচ্ছেন। অভিনেতা তার অভিপ্রায় বুঝতে পারলে ভাল, নইলে পদে-পদে বিভ্রান্তি।

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যের ভূমিকায় একজন অভিনয়ে তালিম নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে অন্য কয়েকটি ভূমিকায় তাঁর কিছু নাম হয়েছে। কাজেকাজেই তাঁর তো একটু 'ইয়ে' হয়েছেই। ইতিপূর্বে নির্দেশক তাঁকে বলেছেন চরিত্রটার মধ্যে সত্য হয়ে ওঠ: তার মধ্যে বেঁচে ওঠ। কিছুদিন যাবার পর তিনি বললেন, 'চরিত্র সৃষ্টিই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।' স্বভাবতই অভিনেতার বিভ্রান্তি। যে বেচারী সত্য হয়ে উঠবার জন্য, চরিত্রটাকে ছোঁবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে, ট্রামে, বাসে, পথে-ঘাটে বিড়-বিড় করতে-করতে, ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে অনেক কাণ্ড করে 'মাথায় ছিট্' আছে মন্তব্য শুনেছে, তার তো বিভ্রান্তি আসবেই। বিদ্রোহ দেখা দেবেই। অথচ সে যদি নির্দেশকের ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হত, তাহলে তার ভেতর প্রতিরোধ দেখা দিত না—তাকে বিনয়ী করে তুলত। নির্দেশক বলতে চাইছেন অভি-নেতার যেমন বাঁচার দায়িত্ব রয়েছে, অন্যদিকে তার অভিজ্ঞতাকে বাইরের রূপ-নির্মীতির মধ্যে ভালভাবে প্রকাশও করতে হবে। সে প্রকাশযন্ত্রের—তার সাধা গলা, তার দেহের—ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ দরকার। সেই অনুশীলনের কথাই তিনি বলতে চাইছেন।

প্রতিরোধ কাটিয়ে উঠে যদি খোলা মন নিয়ে সে বুঝতে চেষ্টা করে তবে তারই ভাল। সফলতা তার আয়ত্তে। তাকে তখন মনে রাখতে হয়, এই বাঁচাটা তো কেবল একটা স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়—অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে তবেই বাঁচা। নির্দেশক আর অভিনেতার মধ্যে সহজ সম্পর্ক দাবি করলেও তা এই সমাজের মানুষ হিসেবেই সহজ নয়। সহজ সম্পর্কটা কোথায়? সমালোচনা শোনবার মতো মনের বনিয়াদ তৈরি নয় বলে সঙ্কট দেখা দেয়।

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকে বটুর ভূমিকায় এক অভিনেতা অভিনয় করলেন। অভিনেতার মনে হয়েছে ভূমিকাটা সহজ। একটা ক্যাপা বুড়ো, ভৈরব ভক্ত, ব্যাস্। এই ধরনের যত ভূমিকা সে এর আগে দেখেছে তার অনুষঙ্গগুলো তার মধ্যে আছে। নিখুঁত রূপসজ্জায়, কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতায় আর সংলাপকে বাহন করে অনায়াসেই সে দর্শককে মুগ্ধ করে দিতে পারবে। হয়ত কিছু দর্শক মুগ্ধ হয়েছিলও। অভিনয় শেষে যখন নির্দেশক মতামত দিতে গিয়ে ভাল না লাগার কথা বললেন, তখন অভিনেতার অহঙ্কারে লাগল। নির্দেশক বোঝালেন তুমি বাইরের একটা কাঠামো আগেভাগে ঠিক করে নিয়ে একজন ক্যাপা মানুষের কথাই ভেবেছ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঐ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কী বলতে চেয়েছেন, সমস্ত নাটকের সঙ্গে তার সংগতি কোথায় তা ভেবেও দেখনি। দীর্ঘদিন ধরে একটা ক্যাপা মানুষ সম্পর্কে তোমার যে ধারণা হয়েছে সেটুকুই কাজে লাগিয়েছ। কার্যকারণ, পরিস্থিতি, বটুর অনুভব, তার পশ্চাদ্‌পট, তার দুঃখের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এ অভিনয় তাই মনকে ভরাল না। স্বভাবতই সে অভিনেতা ক্ষুন্ন হল। ক্ষুন্ন হল তার কারণ সে তো তার বোধ বুদ্ধি-মতো চেষ্টা করেছিল — অনেক যত্ন করে তার মুখের সঙ্গে মানান করে নক্‌শা কেটে চুল দাড়ি তৈরি করিয়েছে, লাল রঙের তুলোর কম্বল কেটে আলখাল্লা বানিয়েছে, তার বড়-বড় চোখগুলোকে কাজে লাগিয়েছে, বনবাদাড় ঘুরে একটা উদ্ভট দেখতে গাছের ডাল কেটে এনে হাতের লাঠি বানিয়েছিল। বেচারা খেয়ালই করেনি যে শুধু ভঙ্গি দিয়ে ভোলান যায় না।

আবার আর এক রকম ক্ষোভও জন্মায়। এ তো ফিল্ম কোম্পানি নয়। এক-একটা বই হচ্ছে — এক-এক দল অভিনেতা নিয়ে কাজ হল, তার পর সেসব অভিনেতার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই রইল না। কোন গোল নেই। কিন্তু নাটকের দলে তো তা হয় না। এক-এক দলে এক-এক দল অভিনেতা-অভিনেত্রী। তাদের সকলকে তো সব নাটকে কাজে লাগান যায় না। লাগান যায় না তার দুটো কারণ: এক, নাটক তো ঘন-ঘন হয় না। দুই, নতুন নাটক তো হামেশা পাওয়া যায় না। কাজেকাজেই দলের লোকের একটা অভিমান রয়েই যায়।

'অভিনয় ন্যাচারাল হবে' — বা 'রিয়ালিটিকে প্রকাশ করতে হবে' - এই নির্দেশে অভ্যস্ত মনে হঠাৎ যদি শোনা যায় — 'ঘটনাটাকে বা চরিত্রকে থিয়েট্রিক্যালি কীভাবে সত্য করে তুলবে?' — আবার বিভ্রান্তি। বড্ড গোলমেলে ব্যাপার। একটা বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র সৃষ্টির কথা এতদিন শোনা গেছে — এখন আবার

অভিনেতার দায়িত্ব চাপল একে থিয়েটারিও করতে হবে। এর মধ্যে কি কোন বিরোধ আছে? অভিনেতা সমস্যায় পড়লেন। ব্যক্তিগত জীবনের প্রেমের যে অনুভব বা ঘৃণার, তার সঙ্গে থিয়েটারে অভিনেয় চরিত্রের প্রেম বা ঘৃণার অনুভূতি কি ভিন্ন? কিংবা এ দুয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই—তফাৎ শুধু থিয়েটারের সঙ্গে যোগ রেখে একে প্রকাশ করার। এইটাই কি চাইছিলেন নির্দেশক থিয়েট্রিক্যালি সত্যি করে তোলার কথায়? মানুষ হিশেবে রিয়ালিটিকে বোঝা এবং শিল্পের স্টাইলকে বোঝা, এটা বেশ মুশকিল। একটা হয় তো আর একটা হয় না। স্বাভাবিক প্রযোজনায় আস্থাবান্ নির্দেশকের সঙ্গে অভিনেতার কাছে এ সমস্যাগুলো নিঃসন্দেহে খুব একটা বাধাই নয়।

কিন্তু পরিচালক যদি সর্বগ্রাসতন্ত্রী হন? তিনি যদি দাবি করেন অখণ্ড অভিনয়শিল্পে তিনিই একমাত্র শিল্পী—বাকি সব উপকরণমাত্র? তখন অভিনেতার আর এক সমস্যা—অভিনেতা যদি অনন্যতন্ত্রী পরিচালকের হাতে উপাদান হয়ে বাঁচতে চান, মারিওনেট্-জাতীয় কলের পুতুল হয়ে নড়তে চান, তাহলে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তা না চাইলেই সমস্যা। অভিনেতা যদি প্রশ্ন করে আমি মানুষ, আমি আপন অধিকারেই স্রষ্টা; শুধু উপকরণমাত্র নই—তার চেয়েও বেশি কিছু। আমি কী করে ভাবব যে পরিচালকের হাতের সুতোর বাঁধন আমার নিয়ন্ত্রণ। সে যদি প্রশ্ন তোলে অভিনয়শিল্পে নটের ব্যক্তিস্বরূপই নাটককে সঞ্চরণশীল করে তোলে—কারণ সে স্বরূপের সার কথা হচ্ছে স্বাতন্ত্র্য এবং প্রয়োজনমত বিস্তারণ ও সংকোচনের অনন্ত ক্ষমতা। জীবন-ঘটিত আবেগ-দম্ভ-গর্ব-সম্পন্ন মানুষকে দিয়ে পুতুলের কাজ করালে জীবনের মননের অপচয়ই হবে। প্রশ্ন তুললে সংঘাত অনিবার্য। অবশ্যই এ প্রশ্নের অধিকার অদীক্ষিতদের নেই। শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খল পরতে দীক্ষিত অভিনেতা কেন চাইবে বলুন?

একবার এক অ্যাবসার্ড নাটকের মহলা চলছে। পরিচালনার দায়িত্ব স্বয়ং নাট্যকারের। তাঁর প্রথম ফতোয়া—কোন চরিত্রের কোন আবেগ প্রকাশ হবে না। কথাগুলো বলে যেতে হবে যেমন করে তিনি বলে দেবেন সেইভাবে। যেমন ভঙ্গি তিনি দেখাবেন সেই ভঙ্গিতে। নাটকটা ধরনে হাসির নাটক। কিন্তু সম্পূর্ণত হাসির নাটক নয়। সেখানে চরিত্রগুলো রাগ করে, ঝগড়া করে, কাঁদে—এবং তারা মানুষ। তাহলে রাগ, দ্বেষ, ক্ষোভ আবেগরহিতভাবে প্রকাশ পাবে কী করে? অভিনেতাদের অনেকেই সেই কথাটা বুঝতে পারছে না। রাগ দেখাতে গেলেই তা একটা আবেগ প্রকাশ পাবে—ক্ষোভেও তাই। কিন্তু নির্দেশকের কড়া

নির্দেশ – কোন আবেগ নয়। নির্দেশকের নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্নের মধ্যে অভিনেতারা ক্রমশ পুতুল হয়ে যেতে লাগল – একটা যান্ত্রিকতা দেখা গেল। যদি এমন হত, সবাই নাট্যকার-নির্দেশকের মতো একইরকম দেখতে, একইরকম কথা বলায় রপ্ত – একই অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ, তাহলে না-হয় এইরকম করে করা যেত। কিন্তু সকলের মুখে একটা সর্বজনীন মুখোশ সেঁটে দেওয়া হত, তাহলে স্বসমুখ আবেগ ঢাকা পড়ত। কিন্তু নির্দেশক আধডজন জ্যান্ত অভিনেতা – যাদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন, চেহারা ভিন্ন, কণ্ঠস্বর ভিন্ন, তাদের একই ছাঁচে ঢালতে চাইলে বিপত্তি তো হবেই। ধরুন নাট্যকার ভদ্রলোক একটা কমিক অভিনয় দেখালেন – ধরুন তার টাক মাথায়, ছুঁচলো মুখে, একটু কুঁজো হয়ে চলার স্বাভাবিক ধরনে অভিনয়টা মজার লাগল – সকলে হাসল। যে অভিনেতাদের তিনি দেখালেন তাদেরও হাসি পেল, কিন্তু ঠিক তেমন ভঙ্গিটি চরিত্রাভিনেতার কাছে কী করে আশা করা যায়। এ এক আচ্ছা সমস্যা। সে অভিনেতার হয়তো গোলগাল মুখ, বড়-বড় চোখ, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল – নাট্যকারের কথিকভঙ্গি সে অনুকরণ করলে আদৌ বাঞ্ছিত ফললাভ নাও হতে পারে। অথচ দাবি করা হল তাই।

এর পর আবার দর্শকদের কথা। তাঁরা তো পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে দেখতে এসেছেন, কাজেই তাঁদের কিছু বলার অধিকার অর্জিত। অভিনেতারা উৎসুক তাদের কথা শুনতে। তাঁরা এলেন, বললেন, চলে গেলেন। ভাল বললে ভাল, মন্দ বললে মন্দ। দর্শকদের চাহিদাও অনেক। তাঁদের চাহিদাটা ওই বামুনের ঘরের গোরুর কাছে চাহিদা পেশ করার মতো। খাবে কম দুধ দেবে বেশি। একেই তো নিজেদের একটা মঞ্চ নেই। বেড়ালছানার মতো আজ এখানে কাল সেখানে টেনে বেড়াতে হয়। অভিনয় করতে পাওয়ার সুযোগটাই কম। যদি-বা একটা নাটক কোনরকমে করা গেল, কয়েকটা সন্ধের অভিনয় হতে-না-হতে তাদের দাবি – 'কই নতুন বই ধরুন'। আর এই চাহিদাটা আমাদেরই কাছে – যাদের চালচুলো নেই, ভিটে নেই।

এইরকম হাজারো সমস্যা – ভেতরের এবং বাইরের – নিয়েই তো পঁচিশ বছর কতকগুলো পাগলের পাগলামি চলছে। আচ্ছা তাই চলুক। রাঁচি কিংবা লুম্বিনি পার্কে গিয়ে পাগলামি সারাতে চাই না। সমস্যাও থাক্‌, পাগলামিও থাক্‌।

অভিনেতার সপক্ষে

আপনি কি বিশ্বাস করেন যে অভিনয় করা আর তার সমালোচক হওয়া এ দুটো কাজ মুগ্ধবোধের সরল সহজ রেখায় সম্ভব নয়? পুরো ব্যাপারটা জটিল—এবং জটিল থেকে জটিলতর। আপনাকে স্বীকার করতেই হবে নবনাট্য আন্দোলনের অন্তে নবনাট্যসংস্কৃতির বনিয়াদের ভিত্তি গড়তে অভিনয়-শিল্প এবং সমালোচনা-সাহিত্য দুটোর দায়ই সবচাইতে বেশি। এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন সংস্কৃতিবান্ দর্শক। আপনি যদি সৎ সমালোচক হন তবে আপনার কাছে স্বভাবতই দাবি করা হবে সুন্দর, নিপুণ অভিনয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে এবং আপনার বিচার-বিবেচনাও পরিশুদ্ধ। আপনি প্রমোদসন্ধানী দর্শকমাত্র নন। সদ্য বর্তমানের বিবেচনায় এবং বাস্তব অবস্থার এলোমেলো হাওয়ায় আপনি সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হলেও আপনার অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখুন। কারণ আবারো দিন আসবে। কারণ সংখ্যা-গুরুর ভালমন্দ বিচারান্ধতাই শেষ কথা নয়।

আপনি যদি সৎ সমালোচক হন তাহলে এখনও ভাল অভিনয় কী তা বুঝতে পারেন এবং আপনার পরিশীলিত বোধের কাছে তা ধরাও পড়ে। ভ্রান্ত বিচার প্রথার বিভ্রান্তিতে আপনি দুঃখ পান নিশ্চয়ই। সবচেয়ে মনোবেদনার কারণ ঘটে বোধহয়, যখন দেখেন যে তাঁরা, যাঁদের অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতামতকে আপনি শ্রদ্ধা করেন, অভিনয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে এমন কথাই বলে ফেলেন যে আপনি হতবাক্। কোন অভিনয়ে তাঁদের প্রশংসা বা অপ্রশংসা দুটোর সম্পর্কেই আপনার প্রশ্নবান জ্যা-মুক্ত হবে।

এই প্রশ্নকণ্টকিত ভূমিকায় পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন যে কোন ভাস্কর্যের প্রদর্শনীতে, উপস্থিত দর্শকের ভাস্কর্ষ সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকলেও নিশ্চয়ই স্বাধীনতা আছে বলবার—যে এই মূর্তিটি আমার ভাল লাগছে—বা—ভাল লাগছে না। কিন্তু এ কথা বলার অধিকার সঙ্কুচিত (যদিচ প্রায়শ এটাই ঘটে থাকে) যে মূর্তিটি খুব সুন্দর হয়েছে বা এর ভাস্কর্য নিকৃষ্ট। এটা ভণ্ডামি। অভিনয় সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞানের অধিকারী না হয়ে এই শিল্প 'সম্পর্কে যাবতীয়

মন্তব্য ভণ্ডামি মাত্র।

আপনি কি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছেন এখানকার কথা ভেবে? আপনিও কি মনে করেন যে থিয়েটার সম্পর্কে বেশিরভাগ সমালোচনাই সংশ্লিষ্ট অভিনয়ের আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই অপাঠ্য হয়ে যায়? আপনার হতাশার মধ্যে কিছু আদর্শ সমালোচনা, মহৎ দৃষ্টান্ত হিশেবে তুলে ধরলে বোধকরি আপনি হতাশায় ভেঙে পড়বেন না – বা আপনার দায়িত্ব অসমাপ্ত রেখে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবেন না।

জর্জ হেনরি লিউইস্। প্রখ্যাত নাট্য-সমালোচক। ১৮২৫-এ তিনি এডমণ্ড কীনের অভিনয়ের দর্শক; স্যালভিনির অভিনয়ের সাক্ষী ১৮৭৫ সালে। তাঁর সম্পর্কে জি.বি. এস.-এর স্বভাবসুলভ, রাম জন্মাবার আগে রামায়ণের অনুসারী উক্তি – '…আমার বিশ্বাস আমার আর্বিভাবটা লিউইস্ আগেভাগে জানতে পেরেছিলেন।' তাঁর সম্পর্কে তিনি বলেছেন – "the rare gift of integrity as a critic।" ইংরেজি নাট্য-সমালোচনায় একসময় আদিতে ছিলেন হ্যাজলিট্ অন্তে শ', এবং মধ্যে এই লিউইস্। তাঁরই কিছু মন্তব্য।

"সাধারণভাবে দেখা যায় যে লোকে প্রায়ই বড়নামী অভিনেতার প্রতিভাকে অতিকৃত করে দেখে এবং অনুশীলিত কুশলতাকে খাটো করে। স্ব-কপোল-কল্পিত কতকগুলি গুণের আধার হিশেবে অভিনেতাকে কল্পনা করে বা না-করে তাকে বড বা ছোট করা হয়। অথচ তাদের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে অভিনেতার আয়াসসাধ্য কৌশল, শ্রম, যা তাকে মহৎ স্রষ্টা করেছে তা ধর্তব্যের মধ্যেই ফেলা হয় না।"

"সাধারণ দর্শক তো আবেগে আপ্লুত হল – কিন্তু আবেগের সূত্র ধরতে পারল না। অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতাকে সে মিলিয়ে দেখল এবং অভিনেতার প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়ে গৌরবটা নাট্যকারকে দিল।"

"আপনি কি স্বীকার করেন যে শিল্প বড় নির্দয় mistress? এই অধিশ্বরীর নির্যাতনকে হাসিমুখে মেনে নিতে হয়। তাই এই যন্ত্রণাকে স্বীকৃতি না দেওয়ার মানে শিল্পীর যন্ত্রণার ফলশ্রুতির পরিবেশকেই অস্বীকার করা।"

লিউইস তাঁর এক সমালোচনা-সঙ্কলনের মুখবন্ধের ইতি টেনেছেন এই বলে যে থিয়েট্রিক্যাল ইযোশানের সূত্রগুলি কী এবং সেগুলো চিনে নিতে যেন অসু-বিধা না হয় কারো – তারই জন্যে এ সঙ্কলন। অভিনয় যে শিল্প সে দিকে দিক-নির্দেশ করার জন্যেই শুধু এ লেখা নয় – অন্য সব শিল্পের মতোই অভিনয়শিল্পও

বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে একগাদা বলগাহীন মন্তব্য দ্বারা যাকে বলা হয় সমালোচনা।
তার দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এর উদ্দেশ্য।

এডমণ্ড কীন্ এবং স্যালভিনির অভিনয়-সমালোচনা প্রসঙ্গে লিউইস একটা জরুরি প্রশ্ন তুলেছেন এবং তার জবাবও দিয়েছেন।

মানুষের মহত্ত্বের মাপকাঠি কী? তার ত্রুটি না গুণ? একটা লোহার বর্গা কতটা মজবুত তার পরখ করা হয় সবচেয়ে দুর্বল অংশটা দিয়ে। মানুষকে বিচার করা হয় তার জোরের জায়গায়। এই শক্তি দিয়েই অভিনেতার বিচার। ত্রুটি দিয়ে নয়।

স্যালভিনি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে তাঁর পরিমাপ করার চেষ্টা তিনি করবেন না। কেবলমাত্র প্রথম দেখার ছবিটি তিনি তুলে ধরবেন।

ড্রুরি লেনে তাঁর অভিনয় একটা অদ্ভুত উত্তেজনা এনেছিল। সেই উত্তেজিত উৎসাহের মাঝে বার-বার কীন্ ও র‍্যাচেলের গৌরবময় দিনগুলিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। যদিও এই উত্তেজনায় বাধা ঘটাচ্ছিলেন তাঁরা যাঁরা স্যালভিনির অভিনয়ের আবেগেও নিরুত্তাপ ছিলেন অথবা যাঁরা তাঁর চরিত্র ব্যাখ্যায় অসন্তুষ্ট। সব সময়েই এটা ঘটল। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই অভিনেতা হিশেবে স্যালভিনির মহত্ত্বকে স্বীকৃতি জানান হল। যদিও অনেকের ধারণা যে ওথেলোর ভূমিকা সম্পর্কে স্যালভিনির ব্যাখ্যা ভ্রান্ত। লিউইসের প্রতিমন্তব্য এই যে শেক্সপীয়ার সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞান এক্ষেত্রে ততটা বিচার্য নয় যতটা বিচার্য হল স্যালভিনির অভিনয়শিল্প-বোধের গভীরতা। শিল্পীর শিল্পচাতুর্য সম্পর্কিত প্রশ্নটা কতকগুলি নির্দিষ্ট বুদ্ধিগ্রাহ্য অভিধার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শেক্সপীয়ার সম্পর্কে বোধের প্রশ্নটা অনির্দিষ্ট, ব্যক্তিগত রুচি, অভিজ্ঞতা, প্রথাসিদ্ধ ধারণার বশবর্তী হয়ে সদা-সঞ্চরণশীল; এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটে যেখানে এই আলোচনাটা মূল নাটকের কোন ধ্রুব নির্দেশের দ্বারা ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই শেক্সপীয়ার ওথেলোকে fiery ও sensual আফ্রিকান হিশেবে চিত্রিত করেছেন কিনা — দীর্ঘদিন ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে যার বহিঃপ্রকৃতি সংস্কৃত হয়েছে, কিংবা সে নেটিভ শিভালরি-জাত একটা সম্ভ্রমবোধ থেকেই ডেসডিমোনার পাণিগ্রহণ করে — কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার জন্যেই নয় — একজন কুমারী মেয়ের সরল সহানুভূতিপূর্ণ বীরপূজার প্রতিদানে জ্যেষ্ঠ যোদ্ধার স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আগ্রহে — এগুলো ঠিক করা ব্যক্তিবিশেষের বোধের ওপরেই নির্ভরশীল। সাক্ষীসাবুদ দু-পক্ষই উপস্থিত করতে পারেন। প্রমাণ করা কঠিন নয় যে 'ওথেলো স্বভাবে পরশ্রীকাতর

না' — 'কিংবা অকারণেই সে পরশ্রীকাতর।' হ্যামলেটের পাগলামি প্রসঙ্গেও যেমন তর্ক থেকেই যায় অর্থাৎ শেক্সপীয়ারের উদ্দেশ্য কী ছিল — হ্যামলেট পাগল হয়ে যায় না সেটা পাগলামির ভান মাত্র — ঐক্যমত হওয়ার দাবি করা যায় না এ সব ব্যাপারে; কিন্তু এ কথা ঠিক যে হ্যামলেট বাক্যে ও ব্যবহারে তখন একটা উত্তেজিত মস্তিষ্কের প্রমাণ দিচ্ছিল। অভিনেতার কাজ এইখানেই, এই অবস্থাটা প্রকাশেই তার দায়িত্ব।

অভিনেতার ব্যাখ্যা সম্পর্কে সমালোচনায় ভিন্ন দৃষ্টিকোণের দুটো পরিচয় উপস্থিত করেছেন লিউইস্। হেনরি লিউইসের মতে — প্রথমোক্ত সমালোচক 'ইম্‌পারটিনেন্ট' — যদি তিনি অভিনেতার ওপর দাবি করেন যে তাঁর পাঠই একমাত্র সত্য পাঠ এবং চূড়ান্ত। আপনি যদি সৎ অভিনেতা হন তাহলে নিশ্চয়ই আপনি অনেকদিন ধরে অভিনীত নাটক এবং ভূমিকাটিকে জেনেছেন সমস্ত খুঁটিনাটি সমেত। মনকে প্রস্তুতও রেখেছেন নাটকের সামান্যতম ইঙ্গিতকে চরিত্রায়ণে সহায়ক করে তুলতে — সমস্ত পারম্পর্য বজায় রেখে স্থির করেছেন একটা চরিত্র, তার কণ্ঠস্বর, ভঙ্গি ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রে একজন সমালোচক যাঁর কোন দায় নেই এইরকম করে চরিত্র বা নাটককে জানার এবং যাঁর পুরো নাটক বা ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা ভাসাভাসা — কেননা কবে পড়েছেন সে নাটক — তখন কী ধারণা জন্মেছিল — যেটা আজও লালিত তাঁর মনে — সেই মনটা নিয়েই, নিজের ধারণা নিয়েই তিনি থিয়েটারের দর্শক আজকে। অভিনেতা এবং সমালোচক, এ ক্ষেত্রে কার ব্যাখ্যা বা গুরুত্ব বেশি?

আপনি যদি সৎ সমালোচক হন তবে আপনাকেও ওই অভিনয়শিল্পীর যন্ত্রণার অংশীদার হতে হবে। কখনও সে যন্ত্রণা অনুভবে এসেছে; তিনি তিলে-তিলে একটা চরিত্রকে, নাটকের আপাততুচ্ছ ইঙ্গিতকে কাজে লাগিয়ে একটা চরিত্র গড়বার খাটুনির কথা ভেবে দেখেছেন? তা যদি না করে থাকেন তবে কেমন করে বুঝবেন যে অভিনয় শিল্প।

হেনরি লিউইস্ অপর শ্রেণীর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে — এঁদের কাছে নাটকের সাধারণ নির্দেশগুলোই সামনে থাকে — এবং এঁরা বলতে পারেন যে অভিনেতা সেগুলি অমান্য করেছেন। এটা অবশ্যই নির্দিষ্ট এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য ভিত্তির ওপর আলোচনাযোগ্য। কিন্তু কখনই কোন অভিনেতাকে দোষ দেওয়া চলবে না যে হ্যামলেট, ওথেলো বা ম্যাক্‌বেথ সম্পর্কে সমালোচকের ব্যক্তিগত ধারণা সেই অভিনেতা প্রকাশ করেননি বলে। কিন্তু নিশ্চয়ই সে অভিনেতা সমালোচনার

যোগ্য যিনি নাটকের পাঠ পাল্‌টে নিয়েছেন। ওথেলো পাশব প্রবৃত্তির জ্বালায় জ্বলছে এ কথা আপনি না-ও মানতে পারেন—কিন্তু সে যে আত্মহত্যা করেছিল বুকে ছুরি বসিয়ে, গলা কেটে নয়, এটা আপনাকে মানতেই হবে।

কাজেই লিউইস্‌ আদর্শ সমালোচক হিশেবেই স্যালভিনির ওথেলোর ব্যাখ্যা সম্পর্কে কিছু বলতে চাননি। তিনি স্যালভিনির নিজস্ব বোধ কীভাবে চরিত্রের অভিনয়ের মধ্যে রূপায়িত হল, সেই কুশলতা সম্পর্কেই বলেছেন। লিউইসের এই বিশেষ নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবং সেই প্রস্তুত মন নিয়েই তিনি স্যালভিনির অভিনয়ের প্রথম রজনীর দর্শক। এডমণ্ড কীনের অসাধারণ স্মৃতি তাঁর মনে চিরজাগরূক। কীনের ওথেলোর অভিনয়ের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তাঁর কাছে তখনও জীবন্ত। তবু অভিনয়ান্তে এই ধারণা নিয়েই তিনি ফিরলেন যে সামগ্রিক বিচারে স্যালভিনির অভিনয় অত্যাদ্ভুত। যদিও কিছু-কিছু অংশে কীনের তুলনায় নিঃসন্দেহে নিঃশেষ।

সেনেটের দৃশ্যে তাঁর রাজোচিত দেহসৌষ্ঠব, বৈচিত্র্যময় আবৃত্তির সূক্ষ্ম কারুকার্য, সুর, ধ্বনি, অপূর্ব। ব্র্যাবান্‌সিওর অভিযোগের সময় কিংবা ডেস্‌ডিমোনার আবির্ভাবে তাঁর অভিব্যক্তির সুসঙ্গত প্রকাশ লিউইসের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করেছিল। অভিনেতার মূল গুণাবলি তাঁর আয়ত্তাধীন। বাচিক এবং আঙ্গিক অভিব্যক্তি বিশেষ করে কণ্ঠস্বরের অভিব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা একমাত্র তাঁরাই করতে পারেন যাঁরা সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের অধিকারী।

কেবলমাত্র সুকণ্ঠের অধিকারী হলেই চলে না—জানতে হয় কেমন করে গান গাইতে হয়,—এটা প্রাথমিক দাবি একজন গায়কের কাছে। সকলেই জানেন এ কথাটা। কিন্তু খুব কম লোকেই জানেন যে অভিনেতার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় গুণ হল কী করে কথা বলতে হয়। এবং বেশিরভাগ অভিনেতা জানেন না কীভাবে কথা বলতে হয়—আর ছন্দে কথা বলা সে তো আরও দুরূহ। স্যালভিনি তা জানতেন—বাক্‌বিভূতির অধিকারী তিনি।

সাইপ্রাসের দৃশ্যে তাঁর সংরাগের অভিব্যক্তি সম্পর্কে যার যত আপত্তিই থাকুক-না কেন, সন্দেহের অবকাশ নেই সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠার বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপনার জন্য। ক্যাসিওকে বিতাড়নের দৃশ্য তেমন করে দাগ কাটেনি মনে। কীনের অবিস্মরণীয় স্মৃতিই সে ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু প্রলুব্ধ হওয়ার দৃশ্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্যালভিনির শিল্পশক্তির অপরূপ প্রকাশ। একটা অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে ধীরে-ধীরে অসহ্য দুঃখানুভূতির সূক্ষ্ম এবং বিচিত্র

অভিব্যক্তি। ইয়াগোর মনের ভিতরটা স্পষ্ট করে দেখতে চাচ্ছে—জানতে চাচ্ছে —অথচ জানতে সাহসও হচ্ছে না—কী জানি? যত্ন-কৃত চেষ্টায় সংগোপন করতে চাইছে ইয়াগোর ইঙ্গিতে তার মনের প্রতিক্রিয়াটা, আর ক্রমশই নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। এ সব অংশের চেয়ে ভাল অভিনয় বুঝি আর হতে পারে না; যেমন তা শিল্পসম্মত তেমনি তা সত্য প্রকাশক। সে মুহূর্তগুলি কী গভীর ট্র্যাজিক, কেননা তা পরম স্বাভাবিক। একটা সম্পূর্ণ এবং যোগ্য ব্যাখ্যা দিলেন যখন বললেন, "Excellent wretch! Perdition catch my soul but I do love thee, and when I love thee not"—একটা মুহূর্তের বিরতি—একটা বিশেষ ভঙ্গিসহ আবার আবৃত্তি করলেন—"chaos is come again." শুধু মানেই স্পষ্ট হল না,—মনে হল সেই ভীষণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে চারপাশের পৃথিবীটা যেন একটা বিপর্যয়ের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। "Farewell the tranquil mind"—এই লাইন অবশ্য কীনের গভীর পুরুষোচিত, নৈর্ব্যক্তিক দুঃখানুভূতির সঙ্গে তুলনীয় নয়। অতি-অভিনয় দোষে দুষ্ট মনে হল। তেমনি "Blood, Iago, blood" এবং "I will tear her to pieces"—এই লাইনে কীন্ যেমন একটা সুতীব্র জ্বালার উত্তাপ ছড়িয়ে দিতেন সেটারও এ ক্ষেত্রে অভাব মনে হল। কিন্তু সমস্ত প্রেক্ষা শিহরিত হল যখন সক্রোধে ইয়াগোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে ওঠেন, "Villain be sure you prove" ইত্যাদি, তখন সে ক্রোধের প্রকাশ যেমন তীব্র তেমনি তা সুপরিমিত। মনে হল একটা সিংহ যেন নেকড়েকে ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে। সজোরে মাটিতে আছড়ে ফেলে হতভাগ্য ইয়াগোকে পদাঘাতে উদ্যত—মনে হল অন্তিম কাল উপস্থিত। এমন সময়েই হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে এল, নিষ্ঠুরতার চরম পর্যায়ে ক্রোধ সংযত হল। 'পশু'র ওপর 'মানুষ'টা জয়ী হল। অনুকম্পা ও আত্মগ্লানিতে হাত বাড়িয়ে দিলেন ইয়াগোকে ধরে তুলতে। এই অভিনয়ের তাল, লয়, কণ্ঠস্বর চমৎকারিত্বে সংগীতের মতোই, এর অভিব্যক্তি অতি যথার্থ এবং আবেগানুগ। লিউইসের কাছে এর স্মৃতি অতুলনীয়। প্রত্যেকটা কথার সঙ্গে ক্রোধের মাত্রা বাড়ছে, সমস্ত দেহ কাঁপছে, মুখমণ্ডল আরক্ত, ক্রমশ সাংঘাতিক হয়ে উঠছে কণ্ঠস্বর, তবু তা স্বর-গ্রামের মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত—কখনই বেসুরো চিৎকার নয়। কীন্‌ও এই অংশে অতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতেন—কিন্তু স্যালভিনি তাঁকেও অতিক্রম করলেন।

চতুর্থ অঙ্কেও তিনি অনুপম। কিন্তু লিউইসের মনে হল, কীন্ প্রসঙ্গে যে বৈশিষ্ট্যকে তিনি ground swell of subsiding passion বলেছেন—সেটার

প্রকাশ ঘটেনি স্যালভিনির রূপারোপে। কী সেটা? প্রচণ্ড ঝড়ের পর বিক্ষুব্ধ সমুদ্র ধীরে-ধীরে শান্ত হয়ে আসছে কিন্তু তখনও প্রচণ্ড দোলা চলছে সমুদ্রের তলদেশে। তাকে কি প্রত্যক্ষ করা যায়? লিউইস্ বলছেন, কীনের বেলায় যেত। এই একই দৃশ্যে। কীন্ কেবলমাত্র সংরাগ প্রকাশের প্রচণ্ডতার জন্যই উল্লেখ-যোগ্য নন, একটা বিরল বৈশিষ্ট্যের জন্যেও তিনি উল্লেখ্য। অপর কোন অভিনেতার অনুভবে এই বিশেষ গুণ পরিলক্ষিত হয়নি। সেটা এই ক্রমবিলীয়মান্ আবেগের প্রকাশ। যদিও কীন্ ভাবের হঠাৎ পরিবর্তন করতে ভালবাসতেন, অর্থাৎ মুহূর্তে 'সাংঘাতিক থেকে স্বাভাবিকে', আলো থেকে অন্ধকারে অনায়াস বিচরণে সক্ষম তিনি। হোক্ তা অস্বাভাবিক, কিন্তু প্রকৃতি-দত্ত শিক্ষায় তাঁর ক্ষমতা ছিল, একট প্রবল আবেগ—একটা ঝড়ের বেগে প্রকাশ করার পরেই প্রকাশ-প্রাবল্যকে কমিয়ে আনার। কিন্তু তখনও সেটা বর্তমান। ঝড় চলে গেলেও ঢেউয়ের দোলন থেকেই গেল। সমুদ্রতলের আলোড়ন তখনও গভীরে ধাক্কা দিচ্ছে। কীনের কম্পমান্ পেশীতে, কণ্ঠস্বরের বিভিন্নতায় সেই ক্রমবিলীয়মান্ আবেগের প্রকাশ ঘটত। কণ্ঠস্বর শান্ত হয়ে আসছে কিন্তু একটা কম্পন রয়ে গেছে, মুখমণ্ডলও হয়তো প্রশান্ত কিন্তু সদ্যোক্রান্ত বিক্ষোভের অপস্রিয়মান্ চিহ্নও বর্তমান।

সাধারণ দর্শক কীন্‌কে ইম্‌পাল্‌সিভ অভিনেতা বলত। তারা এই শব্দটা ব্যবহার করে যদি এই বোঝাতে চায় যে কীন্ নিজেকে হঠাৎ আবেগের হাতে সমর্পণ করতেন—পূর্বচিন্তা বা পরিকল্পনা ব্যতিরেকে—তা হলে ভুল বলা হবে। কীন্ শিল্পী, এবং শিল্পে সমস্ত কার্যকারণ সুনিয়ন্ত্রিত। একটা বিশেষ মুহূর্তে হঠাৎ উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠা—এইটাই তারা বলতে চাইত বোধহয়। কিন্তু বুদ্ধিমান্ সচেতন শিল্পী হঠাৎ উদ্বুদ্ধ হওয়ায় বিশ্বাসী নন। তিনি জানেন সত্য কী, সেটা ধরতে পারেন তিনি, নিয়ন্ত্রণও করেন। পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতিরেকে কোন শিল্পের অনুপাত ঠিক রাখা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে অভিনেতা ত্রুটিপূর্ণ ইম্‌পাল্‌সেরই শিকার—শিল্পভ্রষ্টা নয়। কীন্ অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সজাগ দৃষ্টি রেখেই মহলা দিতেন, সমস্ত খুঁটিনাটিকে ধরবার জন্যে। গলার স্বর তাঁর নিজের কানে তৃপ্তি-দায়ক না মনে হলে অবিরাম চেষ্টা চলত; চোখের দৃষ্টি, দেহের ভঙ্গি ঠিক করতেন যতক্ষণ-না তাঁর শিল্পবোধ তৃপ্ত হত। এবং একবার সেগুলো সুনিয়ন্ত্রিত হলে আর কখনও তা পরিবর্তিত হত না। এই চেষ্টা, এই যত্ন, এই কষ্ট করতেন বলেই শরীর যখন অশক্ত, কণ্ঠস্বর ভগ্ন, তখনও অভিনয়ের সময় তাঁর বক্তৃতা স্বরাঘাত ছন্দ

তার শক্তি অপরিবর্তিত।

শিল্পীর এই দুরূহ প্রয়োগের সঙ্গে আপনার কি পরিচয় আছে? আপনি যে শিল্পের শিল্পী এবং সমালোচক, উভয়ের কাছেই এটা দাবি।

কীনের অনেক ত্রুটির কথাও উল্লেখ করেছেন লিউইস্; কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাও বলেছেন, দর্শকের উপায় ছিল না কীনের অভিনয়ের আবেগে অভিভূত হওয়া ছাড়া। ত্রুটির কথা তখন বেমালুম ভুলে যেত কিংবা গুরুত্বই দিত না। তার কারণ ওথেলো, শাইলক বা রিচার্ড-বেশী কীন্‌কে দেখে তার প্রচণ্ডতায়, তার দুঃখে, তার ঝোড়ো আবেগের দুর্দম প্রকাশে অভিভূত না হয়ে থাকতে পারা যেত না।

স্যালভিনির অভিনয় দেখতে-দেখতে কীনের স্মৃতি ভেসে আসছিল লিউইসের মনে। শেষবারের মতো কীনের ওথেলোর অভিনয় দেখার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি; দেহের দিক থেকে অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল কীনের। বিশাল-দেহী তিনি নন; ম্যাক্‌রেডির পাশে তাকে অকিঞ্চিৎকর মনে হত। ম্যাক্‌রেডি সাজতেন ইয়াগো। কিন্তু তৃতীয় অঙ্কে যখন ইয়াগো তাকে উত্তেজিত করে তোলে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তখন উত্তেজিত ওথেলোর বিস্ফোরণ ঘটে "Villain be sure you prove...."। মনে হত যেন কীন্ কোন যাদুবলে বিরাটদেহী হয়ে উঠেছিল, তখন ম্যাক্‌রেডিকে অতি তুচ্ছ মনে হচ্ছে তাঁর পাশে। সেই শেষ-দেখা অভিনয়ের দিন কীন্ বাতে প্রায় পঙ্গু, একদা তুলনাহীন কণ্ঠস্বর তখন অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে কর্কশ—তা সত্ত্বেও এমন এক অপ্রতিরোধ্য দুঃখানুভূতির প্রকাশ ঘটালেন যা কান্নায় ভেঙে পড়া নয়—যা যথার্থ পৌরুষব্যঞ্জক।

এই কান্নার প্রসঙ্গে স্যালভিনির কথা এসে যায়। 'ওথেলো'র পঞ্চম অঙ্কে এসে তাঁকে আর ভাল লাগেনি লিউইসের। অবশ্য একবার, হ্যাঁ,—ডেসডিমোনা নিরপরাধ এ কথা জানবার পর স্যালভিনির সুতীব্র চীৎকারের সময় ছাড়া। লিউইসের মনে হয়েছে পঞ্চম অঙ্কে স্যালভিনির অভিনয় অতিকৃত এবং কম অনুভূত। বলা ভাল, ভাবনাটা যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। তারই ফলে অভিনয়ে গভীরতা এল না। এবং সেইটাকে ঢাকতে গিয়েই যেন বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিতে হল। এ যেন নববধূর রূপ দেখতে এসে তার অলঙ্কার দেখে ফেরা।

তাঁর অভিনয়ে গভীর দুঃখানুভূতির অভাব থেকে গেল। কণ্ঠস্বর বা আবেগে কান্না নেই, কান্না চোখের জলে। বস্তুত, অস্বস্তিকর তাঁর জলভরা দুই চোখ। আবেগের মধ্যে কান্না আর চোখের জলে কান্না, এ দুটো একেবারেই স্বতন্ত্র।

শোক যেখানে গভীর, চোখের জল সেখানে নৈর্ব্যক্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয় শিল্পের ক্ষেত্রে। আত্মকরুণার কোন দাম নেই; অভিনেতার বেদনার মধ্যেই আমরা দেখতে চাই দুঃখের একটা সর্বজনিক রূপ। ট্র্যাজিক প্যাশনের মধ্যে সমস্ত মানুষের দুঃখকে অনুভব করতে চাই। নিজেকে করুণা করে নয়—যতই ভীষণ হোক্ সে ব্যক্তিগত দুঃখ, ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে আমার আপনার সকলের দুঃখ যদি প্রকাশ পায় তবেই তার সার্থকতা, তার কারণ প্রকাশমাধ্যমই যে শিল্প।

এ সব বাদ দিয়েও স্যালভিনিকে প্রথম দেখার অভিজ্ঞতাকে লিউইস্ বর্ণনা করেছেন যে জীবনে একবার কিংবা দু-বারই এ দেখার অভিজ্ঞতা জন্মায়। এমন করে অভিনয়ের বিশ্লেষণ কে করতে পারে? যে অভিনয়শিল্পের আদি-অন্ত জানে সেই পারে—পারে 'সেইজন' যে এই শিল্পের সেবক। কী অবস্থার মধ্যে এ শিল্প সম্ভব সেটাও যার জানা।

আপনি যদি মনে করেন অভিনয়টা শখের জন্য, তাহলে জানবেন তার সমালোচনাও শখের হবে। আর দর্শকও মজার মজতে যাবে। নইলে আপনি নিশ্চয়ই দাবি করবেন, আপনার শিল্পসৃষ্টির সমালোচনা শিল্প-পাগল মানুষেরাই করুক; যে জানে এ শিল্পের কষ্ট কী, সুখ কিসে। দাবি স্বাভাবিক যে আপনার শিল্পের দর্শক—সংস্কৃতিবান্ রুচিবান্ হোক্।

আবেগ প্রসঙ্গ

ছাপানো নাটকের অন্তর্গত একটি চরিত্র সৃষ্টি করার অর্থ সেই চরিত্রটিকে বা সেই মানুষটিকে রক্ত-মাংসের শরীর দান। অর্থাৎ সেই চরিত্রকে মঞ্চে একজন অভিনেতার মাধ্যমে রূপদান। যেহেতু অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পীর সৃষ্টি-উপকরণগুলো স্বতন্ত্র, সে ক্ষেত্রে কাজটা অভিনয়শিল্প অপেক্ষা কিছুটা ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে অভিনেতার সৃষ্টি-উপকরণ সে নিজে, তাই কাজটা জটিল। কেননা অভিনেতা একজন রক্ত-মাংসের মানুষ, তাকে অপর একজনের ব্যক্তিস্বরূপে প্রকাশিত হতে হয়। চরিত্রসৃষ্টি মানেই একজনকে আর-একজন হতে হয়। অভিনেতা যেন মাটি তাকে একটা মূর্তিতে পরিণত হতে হয়। এ সব কথা অভিনয়শিল্পের প্রাথমিক কথা। মাটি ভাল না হলে তা দ্বারা ভাল চরিত্রসৃষ্টি সম্ভব নয়।

আমরা জানি, একটি চরিত্রসৃষ্টির উপায় সে কারণেই অভিনেতার মন, তার কল্পনার প্রসার এবং অনুভব করার ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। আমরা এও জানি যে অভিনেতাকে এ কাজ করতে হয় বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে। কোন একটাকে বাদ দিয়ে এই শিল্পে সৃষ্টি সম্ভব নয়।

একটি চরিত্রে রূপদানের প্রাথমিক পর্যায় চরিত্রটির সঙ্গে পরিচয় এবং শেষ পর্যায় চরিত্রটিকে অবয়বদান অর্থাৎ রূপদান। মাঝখানে আছে চরিত্রটির আবেগ অভিজ্ঞতা। এই আবেগ অভিজ্ঞতা কী? চরিত্রসৃষ্টির প্রধান অবলম্বন চরিত্রটির আবেগ অনুভব করা এবং তা প্রকাশ করবার যোগ্যতা। তর্কের অবকাশ থাকলেও অভিনীত চরিত্রের মূল লক্ষ্য হল দর্শকদের আবেগমথিত করা।

আবেগ প্রকাশের বা সৃষ্টির পন্থা: প্রাচীনতম উপায়, যা বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে তা স্তানিস্লাভস্কি নির্দেশিত পথেই ঘটেছে দেখতে পাচ্ছি। 'স্মৃতির কার্যকারিতা' সম্পর্কে স্তানিস্লাভস্কি যা বলেছেন তারই অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেছে সফোক্লেসের ইলেক্ট্রা। চরিত্রের রূপদানকারী অভিনেতা সেই প্রাচীনকালে ওরেস্টেসের মৃত্যুজনিত শোকের এবং দুঃখের আবেগ সত্য করে প্রকাশ করবার জন্য আপন সন্তানের সমাধিক্ষেত্র থেকে চিতাভস্ম এবং ভস্মাধার নিয়ে রঙ্গস্থলে

অবতীর্ণ হয়ে এক অবিস্মরণীয় শোকের আবেগ প্রকাশ করেছিলেন। একটা সত্য আবেগ অনুকরণের এ এক অভিনব পন্থা।

অ্যারিস্ততলের সূত্র অনুযায়ী আমরা জানতে পারছি এই আবেগ প্রকাশের সূত্র কী। তিনি বলেছেন, "They will be most convincing who themselves experience the feeling they represent." সিসেরোও (খ্রীঃ পূঃ ১০৬-৪৩) প্রায় একই কথা বলেছেন—কলাকৌশলের দ্বারা আবেগ প্রকাশ করা যায় না, আবেগ অনুভব করলে তবেই অন্যের মধ্যে আবেগ সঞ্চারিত করা যায়।

অ্যারিস্ততল তাঁর 'রেটরিক'-এ পনেরটি বিভিন্ন আবেগের উল্লেখ করেছেন। এবং প্রাচীন গ্রীক্ অভিনয়ের আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই প্রাথমিক অভিনয়ধারায় চরিত্রসৃষ্টি করতে গ্রীক্ অভিনেতারা এটা অনুভব করতেন যে অ্যাকশন থেকেই আবেগের উদ্ভব। আধুনিক কালে স্তানিস্লাভস্কি যে কথা বিশদভাবে বলেছেন তা অ্যারিস্ততল সেই প্রাচীন কালে একটু সরল করে অভিনেতাদের আবেগ সৃষ্টির উপায় সম্পর্কে বলেছেন, "· to find the emotion in an action completed or thwarted." সুসম্পূর্ণ বা বাধাপ্রাপ্ত ক্রিয়ার মধ্যেই আবেগ সৃষ্টি হয়। এছাড়াও তিনি শিল্পীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, "should assume the very attitudes and gestures appropriate to the emotions of the agents." আবার বলেছেন. "They will be most convincing who themselves experience the feelings they re present." অভিনেতার ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য।

শিল্পসৃষ্টির আলোচনায় আমরা সক্রেটিস্ এবং প্লেটোর অভিমত বিশ্লেষণ করে যদি সক্রেটিস্-এর মতকে স্বীকার করি তাহলে দেখব যে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক আশীর্বাদপুষ্ট হলেই চলে না তার সঙ্গে বিজ্ঞান ও অনুশীলনও অবশ্য-প্রয়োজনীয়। পক্ষান্তরে প্লেটোর অভিমত যে, কোন অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, প্রারব্ধ জ্ঞান আর অনুপ্রাণিত মনই যথেষ্ট।

আজকের যুগে আমরা অনুপ্রেরণা বা দৈবানুভূতির ওপর নির্ভর করতে পারি না। অনুপ্রেরণা সম্পর্কে বলা যায় যে অনুপ্রেরণা হল আকস্মিকভাবে অন্তরের অন্তস্থলে যা জমা আছে অনেকদিন থেকে, সংগোপনে লালিত তার বহিঃপ্রকাশ। অভিনেতার ক্ষেত্রে স্বভাবতই সে বহিঃপ্রকাশ প্রয়োজনের মুহূর্তে।

আবেগ অনুভব নিয়ে আমাদের নাট্যশাস্ত্রেও তর্ক দেখতে পাচ্ছি। ভরত

বলেছেন, যতদূর সম্ভব অভিনেতাকে চরিত্রের আবেগ অনুভব করে তা প্রকাশ করতে হবে। পক্ষান্তরে বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণে' বললেন, 'অভিনেতার মধ্যে আবেগ উত্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, সে নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী কৌশল দ্বারা তা প্রকাশ করবে।' এ প্রায় দেনি দিদেরো এবং কর্কেল্যার অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর সূত্র।

যাই হোক, আমাদের আলোচনা এই আবেগ সৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কে। এ কাজে সবচেয়ে প্রথম প্রয়োজন প্রেরণা। আবেগের প্রেরণা। অবশ্যই এই প্রেরণা দৈবের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। অভিনেতা যদি নিজেকে সচেতনভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তৈরি করেন তবেই তাঁর পক্ষে চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব। তখন প্রেরণা তাঁর বশীভূত হবে।

আবেগের একটা প্রতিমা গড়া অভিনেতার প্রাথমিক কাজ। এই প্রতিমা তাঁর স্মৃতির অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়। আবেগ সৃষ্টি হয় অন্তরের অন্তস্থলে। ওটা যেন জলাধার। এবং একজন অভিনেতা অনুশীলন করবে কী করে সেই জলাধারের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী নলের মুখের কলটা খোলা যায়। অভিনেতা মঞ্চে যা করছেন অর্থাৎ তাঁর ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই এই আবেগ প্রকাশিত হয়ে ওঠে। মনের অবচেতনে যে স্মৃতি লুকিয়ে আছে তাকে চেতন স্তরে নিয়ে আসতে হয়। তারপর নাটকের বা দৃশ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে সাজিয়ে নিয়ে প্রকাশ করতে হয়। প্রকাশিত হয় ওই ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। তাত্ত্বিকরা বলছেন যদি আবেগকে সত্য করে তুলতে হয় তাহলে মঞ্চের ঘটনায় বিশ্বাস উৎপাদন করা অভিনেতার প্রথম কর্তব্য। একটি ভূমিকায় যদি একবার সত্য বিশ্বাস জন্মায় তাহলে এক মুহূর্তেই সজ্ঞানে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে একটা আবেগের সৃষ্টি হবে।

আবেগের সঙ্গে যুক্ত বাহ্যিক ক্রিয়াগুলি যদি বিশ্বাসের সঙ্গে করা যায় তাহলে স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ সৃষ্টি হতে পারে। বড়-বড় কবিদের লেখায় দেখা যায় অতি সাধারণ ঘটনাকে ঘিরে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের ব্যঞ্জনা এবং তারই মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের আবেগকে উজ্জীবিত করবার নানা কৌশল। আবেগ প্রকাশের রীতিনীতিগুলি যখন যথাযথ আয়ত্ত করতে পারা যায় তখন যে-কোন আবেগ-মুহূর্ত সম্পর্কে অভিনেতাদের মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে যায়। এই-ভাবে অভিনেতার মনে আবেগ সঞ্চারিত হলে – যে মুহূর্তে সে কল্পনার ইঙ্গিত পাবে সেই মুহূর্তে দর্শককে সে নাড়া দিতে পারবে। আকস্মিকতার বা জবরদস্তি আবেগ প্রকাশের কোন স্থান ভাল অভিনয়ে নেই।

আবেগের ব্যাপারে আসল কথা হল স্মৃতি। সে স্মৃতি অভিনেতার আত্মনির্ভর হোক্ বা অপরের সাহায্য পুষ্ট হোক্ – এ দুয়ের মধ্যে সত্যকারের পার্থক্য নেই। স্মৃতি দিয়ে অনুভূতিগুলোকে ধরে রাখা, আবেগের মুহূর্তে সেগুলিকে ফিরিয়ে আনতে পারাই আসল সমস্যা। তখন দেহমন দিয়ে তাকে বিশ্বাস না করে কারো উপায় থাকে না। শুধু প্রেরণাদীপ্ত অভিনয়ে এ কাজ বার-বার ঘটে না।

অভিনয় আবেগ-বর্জিত হবে কিংবা প্রতি অভিনয়-রাত্রে সত্য আবেগ সৃষ্টি করা উচিত কিনা, কেবল কলাকৌশল দ্বারা আবেগের প্রতিমাটা গড়ে তোলাই আধুনিক অভিনয়ের অভিধা কিনা সে আলোচনা স্বতন্ত্র এবং সম্ভবত এ তর্কের মীমাংসা কোনদিনই হবে না। এই সূত্রে স্তানিস্লাভস্কির 'এ্যান এ্যাক্টর প্রিপেয়ারস' থেকে একটি পরিচ্ছেদ "অভিনয়ে আবেগানুভূতি"-র অনুবাদ এই আলোচনায় সহায়ক বিবেচনায় সংযোজিত হল।

"স্কুলে এসে দেখি দেয়ালে বিরাট প্ল্যাকার্ড, তাতে লেখা 'বিশ্বাস ও সত্যানুভূতি'। কাজ শুরু হবার আগে, প্রায়ই যা করতাম, সবাই আমরা মারিয়ার হারানো টাকার ব্যাগ খোঁজায় ব্যস্ত। পরিচালক যে তখন অর্কেস্ট্রায় বসে সব দেখছেন তা আমরা জানতেও পারিনি। হঠাৎ তাঁর কথা শুনতে পেলাম, 'তোমরা যা করছিলে তার মধ্যে চমৎকার আন্তরিকতা ছিল, সততা ছিল, নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আস্থা ছিল। স্পষ্ট সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় তোমাদের লক্ষ্য ছিল তীক্ষ্ণ ও একাগ্র। এই যে যথাযথ পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রয়াস তোমাদের, একে কী বলা যায়? শিল্প? না। এ শিল্প নয়। এ হল বাস্তবতা।' আমরা টাকার ব্যাগটা আগের জায়গায় রেখে দিয়ে আবার খোঁজা শুরু করলাম। কিন্তু এবারে আর তেমন খুঁজতে হল না, কারণ জিনিশটা একবার খুঁজে পেয়েছি। ফলে এবারে কিছুই আমাদের করা হল না।

"টর্টসভ সমালোচনার ভঙ্গিতে বললেন, 'না। তোমরা যা করলে তার মধ্যে না দেখলাম কোন উদ্দেশ্য, না পেলাম কোন প্রয়াস বা সত্যের আভাস। কিন্তু এরকম কেন হল? প্রথমবারে যা করেছিলে তার মধ্যে যখন বাস্তবতা ছিল তখন সেটাই আর একবার কেন পারলে না?' আমরা টর্টসভকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে প্রথমবারে হারানো ব্যাগটি খুঁজে পাওয়া আমাদের দরকার ছিল। দ্বিতীয়বারে আমরা জানতাম, সে দরকার আর নেই। এর ফলে প্রথমবারে যা ছিল বাস্তবতা, দ্বিতীয়বারে তাই হয়ে দাঁড়াল বাস্তবতার একটা অনুকরণ মাত্র।

'ঠিক আছে', টর্টসভ বললেন, 'দ্বিধায় বললে সত্য দিয়ে ভুলটা সাজাও

আবার।' আমরা আপত্তি জানালাম। বললাম, কাজটা ঠিক অত সহজ নয়। খুব জোর দিয়ে বললাম, আমাদের তৈরি হতে হবে, অনুশীলন করতে হবে, দৃশ্যটিকে জীবন্ত করে তুলতে হবে ···। 'জীবন্ত করে তুলবে?' টর্টসভ-এর গলায় বিস্ময়ের স্বর : 'এইমাত্র তো তাই করলে তোমরা।'

"অতঃপর, ধাপে-ধাপে, নানা প্রশ্ন আর ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে টর্টসভ আমাদের যা বোঝালেন তা হল এই যে যা-কিছু আমরা করি তার পেছনে সত্য ও আস্থার যে বোধ থাকে তাকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে (যা হয়েছিল টাকার ব্যাগটা প্রথমবারে খোঁজার সময়)। দ্বিতীয়টিকে বলা যায় সাজানো ব্যাপার। তার মধ্যেও সত্য আছে, কিন্তু সে সত্যের জন্ম কল্পনার ক্ষেত্রে, শিল্পের রূপকথায়।

"'এই দ্বিতীয় পর্বে সার্থক লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তোমাদের একটা কল্পিত জীবনের ক্ষেত্রে নিজেকে তুলে আনতে হবে। সেখানে এমন একটা দৃশ্য তোমরা রচনা করবে কয়েক মুহূর্ত আগের বাস্তবতার সঙ্গে রূপরেখায় যা সদৃশ। সাধারণত ব্যবহারিক জীবনে আমরা তাকেই সত্য বলি যার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ, যে কোন লোক তাকে জানে। পরন্তু মঞ্চে এই সত্য কোন প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের ব্যাপার নয়। এটা, যা হতে পারে, তার একটা সম্যক্ বোধ।'

"গ্রিশা তর্কের মেজাজে বলে উঠল, 'মাফ করবেন, আমি তো বুঝতেই পারি না থিয়েটারে, যেখানে সবকিছুই কৃত্রিম, শেক্সপীয়ারের নাটক থেকে শুরু করে আত্মহত্যার জন্যে ব্যবহার করা ওথেলোর কাগজের ছোরাখানি পর্যন্ত, সেখানে, বাস্তবতা, সত্য, এ সব প্রশ্ন ওঠে কী করে?'

"প্রায় একটা আপসের ভঙ্গিতে টর্টসভ বললেন, 'ছোরা ইস্পাতের না হয়ে কাগজের হল কেন, তা নিয়ে অযথা মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ওটাকে নকল বলার অধিকার নিশ্চয়ই তোমার আছে। কিন্তু আরো একটু এগিয়ে, সমস্ত শিল্পকেই যদি তুমি মিথ্যে বলে চিহ্নিত কর, থিয়েটারের জীবনকে যদি বল বিশ্বাসের অযোগ্য, তাহলে তোমার দৃষ্টিকোণ পাল্টাতে হবে। থিয়েটারে যেটা আসল কথা সেটা এ নয় যে ওথেলোর ছোরা ইস্পাত কিংবা কাগজ কিসের তৈরি। আসল কথা হল, আত্মহত্যার অনিবার্যতা প্রমাণ করতে পারে যে শিল্পী তার একান্ত হৃদয়ানুভূতি। ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করছে যে রক্তমাংসের মানুষ, ওথেলোর মতো পরিবেশে পড়লে, হাতে কাগজের বদলে ইস্পাতের ছোরা থাকলে সে কী করতে পারত সেটাই আসল কথা। মঞ্চে আমাদের চারপাশে

বাস্তবতার যে অস্তিত্ব, আমাদের অনুভূতির জন্ত একটা পশ্চাৎপট রচনা ছাড়া তার সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই।

"থিয়েটারে বাস্তবতা বলতে আমরা বুঝি সৃষ্টির মুহূর্তে যে নাটকীয় বাস্তবতা-কে অভিনেতা ব্যবহার করতে পারেন। শুরুতে যে-কোন নাটক এবং তার দৃশ্য -পটের বাস্তবতার দিক ও কল্পনার দিক নিজের মনের মধ্যে ভালভাবে বুঝে নেবার চেষ্টা করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার সত্যের বোধ তৃপ্ত না হয় এবং তোমার অনুভূতির সত্যতা সম্পর্কে প্রত্যয় না জন্মে, ততক্ষণ কল্পিত পরিবেশ এবং ঘটনা-বলিকে জীবন্ত করে তুলবে। একেই বলে অভিনীত চরিত্রের যোগ্য হয়ে ওঠা।

"আমি টর্টসভের বক্তব্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে চাইলাম। তাই দু-একটি কথায় তাঁর বক্তব্যের সারাংশটি জানাতে অনুরোধ করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, 'মঞ্চে তাকেই সত্য বলব, যা আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে পারব, নিজে-দের মধ্যেই হোক্ আর সহকর্মীদের মধ্যেই হোক্। আমাদের বিশ্বাস থেকে সত্যকে আলাদা করা যায় না। তেমনি সত্য থেকেও আলাদা করা যায় না বিশ্বাসকে। এদের একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তেমনি এই দুটিকে বাদ দিয়ে তোমাদের অভিনয়ে প্রাণসঞ্চার করা কিংবা কিছু সৃষ্টি করা অসম্ভব। মঞ্চে যা-কিছু ঘটে, অভিনেতার কাছে, সহশিল্পীর এবং দর্শকের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠা চাই। সত্যিকার জীবনে যা দেখি তার সঙ্গে মঞ্চে অনুকৃত জীবনের সাদৃশ্য-সম্ভাবনায় আমাদের যাতে বিশ্বাস জন্মে, তার জন্যে প্রেরণা চাই। অনুভূত আবেগ এবং অভিনীত ঘটনাবলির সততায় পরিপূর্ণ বিশ্বাস আমাদের প্রতিটি মুহূর্তকে সম্পৃক্ত করে তুলবে।'

"আজকের পাঠ শুরু হল নির্দেশকের এই কথায়: 'মোটামুটি তোমাদেব আমি বুঝিয়েছি সৃজনশীলতায় সত্যের কী ভূমিকা থাকে। এবারে, এস, এর উল্‌টো দিকটা নিয়ে আলোচনা করা যাক্। সত্যের যে বোধ তার মধ্যেই অসত্যের বোধও নিহিত থাকে। এর অনুপাতের অবশ্য কম-বেশি হয়। মনে কর, একজনের ক্ষেত্রে সত্যের বোধ শতকরা ৭৫, অসত্যের বোধ শতকরা মাত্র ২৫। কারুর ক্ষেত্রে এর উল্‌টো, কিংবা প্রতি ভাগেই শতকরা মাত্র ৫০। দুটি বোধকে এই যে আমি আলাদা করে ফেলেছি এতে তোমরা কি অবাক হচ্ছ? কিন্তু আমি কেন করছি জান?'

"নিকোলাসের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন: 'এমন কিছু অভিনেতা আছে যারা তোমাদের মতো কঠোর সত্যনিষ্ঠ হতে গিয়ে নিজেদের অজান্তে এত

বাড়াবাড়ি করে ফেলে যে সেটা মিথ্যার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। সত্যের প্রতি তোমাদের পক্ষপাতিত্ব এবং মিথ্যার প্রতি বিতৃষ্ণাকে কখনও অনেকখানি বাড়িয়ে তুলো না; তাতে সত্যের খাতিরেই সত্যকে তোমরা অযথা অতিরঞ্জিত করে তুলবে এবং সেটা হবে চূড়ান্ত মিথ্যা। কাজেই সংযত পক্ষপাতহীন হবার চেষ্টা করবে। থিয়েটারে ততটুকু সত্য তোমাদের প্রয়োজন যতটুকুতে তোমরা আস্থা রাখতে পার। যুক্তিসঙ্গতভাবে বিচার করতে পারলে মিথ্যাকেও তোমার কিছু কাজে লাগাতে পার। সঠিক মাত্রা নির্দিষ্ট করে দিয়ে মিথ্যা তোমাদের বলবে, কী তোমাদের করা উচিত নয়। সে ক্ষেত্রে সামান্য একটুখানি ত্রুটি ব্যবহার করে একজন অভিনেতা স্থির করতে পারবে কোন্ সীমারেখার বাইরে তার পদক্ষেপ অনুচিত।'

"যখনই তোমারা সৃজনশীল কিছু করবে এইভাবে নিজেকে পরীক্ষা করে নেওয়া তোমাদের বিশেষ প্রয়োজন। স্বেচ্ছায় হোক্ বা না হোক্, বিরাট দর্শকমণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে অনেক অহেতুক প্রয়াস ও অঙ্গভঙ্গি করবার একটা প্রবণতা অভিনেতার মধ্যে দেখা যায়। এ সত্ত্বেও যতক্ষণ অভিনেতা ফুটলাইটের সামনে থাকে, যা-কিছুই করুক, তার মনে হয় যেন ঠিক যথেষ্ট করা হয়ে উঠল না। এর ফলে আমরা অভিনয়ের আতিশয্য দেখি, কোন-কোন ক্ষেত্রে যা শতকরা নব্বই ভাগ। তাই মহলাকালীন তোমরা মাঝে-মাঝে আমাকে বলতে শুনবে, 'শত-করা নব্বই ভাগ কেটে দাও।'

"তোমরা যদি জানতে আত্মসমীক্ষার কী বিরাট প্রয়োজন! অভিনেতার অজ্ঞাতসারে এই আত্মসমীক্ষার পর্বটি অবিরাম চলবে, তার প্রতিটি পদক্ষেপকে যাচাই করেনেবে। কোন অভিনেতারএকটি মিথ্যা ভঙ্গি কিংবা অভিনয়ের আপাত-বৈসাদৃশ্য যদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায়, তবে সাগ্রহে সেই আতিশয্যকে সে ছেঁটে ফেলবে। কিন্তু নিজের ভেতর থেকে প্রত্যয়ের বোধ না জন্মালে সে কী করবে? একটা ভুল শুধরে নিয়েই আর একটা ভুল সে করবে না, এ গ্যারান্টি কে দেবে? তাই ব্যাপারটি অন্য দিক থেকে বিচার করতে হবে। মিথ্যার নিচে সত্যের একটি বীজ বুনে দিতে হবে, কালক্রমে যা ঐ মিথ্যাকে উপড়ে ফেলবে, যেমন দ্বিতীয় একসারি দাঁত শিশুর দুধের দাঁতকে নির্মূল করে দেয়।

"এইসময় কিছুক্ষণের জন্য নির্দেশককে থিয়েটারের কাজে বাইরে যেতে হওয়ায় ছাত্রদের ভার পড়ল সহকারী নির্দেশকের হাতে। ফিরে এসে টর্টসভ একজন অভিনেতার কথা আমাদের বললেন। এই অভিনেতার এক অসাধারণ ক্ষমতা

ছিল যাতে অন্যান্য অভিনেতাদের কাজের সমালোচনা করতে পারত। অথচ নিজে অভিনয় করার সময় ঐ ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলত। বিশ্বাস করা কঠিন যে সহ-অভিনেতাদের অভিনয় সম্পর্কে এই মুহূর্তে এমন যার চুলচেরা বিচার, পরমুহূর্তে নিজেই সে ওদের চেয়ে অনেক খারাপ ভুল-চুক করে ফেলত। সত্য ও মিথ্যা সম্পর্কে দর্শক হিশেবে তার যে অনুভূতি, অভিনেতা হিশেবে সে অনুভূতির মধ্যে অনেক ব্যবধান। এই বৈচিত্র্যটি অভিনেতাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়।

"আজ নতুন একটা খেলার কথা আমরা ভাবলাম। আমরা স্থির করলাম মঞ্চে এবং সাধারণ জীবনে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে মিথ্যাচার রয়েছে, তা আমরা লক্ষ করব। স্কুলের স্টেজ তখনও সাজানো হয়নি. সবাই বারান্দায় অপেক্ষা করছি। হঠাৎ মারিয়া প্রচণ্ড সোরগোল তুলল তার চাবি হারিয়ে গেছে। অমরা সবাই চাবি খুঁজতে লেগে গেলাম। গ্রিশা মারিয়ার সমালোচনা শুরু করল। বলল, 'তুই এমন ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিস যে মনে হচ্ছে চাবি খোঁজার জন্য নয়, আমাদের দেখবার জন্য ওরকম করছিস।' সঙ্গে-সঙ্গে লিও, ভ্যাসিলি, পল এবং আমিও কিছু-কিছু মন্তব্য করলাম এবং চাবি খোঁজার কাজ থেমে গেল। সেই সময় নির্দেশকের গলা কানে এল। খেলার মাঝখানে তিনি আমাদের ধরে ফেলেছেন জেনে একটু খারাপ লাগল।

"সবাই তোমরা দেয়াল ঘেঁষে বেঞ্চিতে বসে পড়, আর তোমরা দু-জন, মারিয়া এবং সোনিয়া, ঘরের এধার থেকে ওধারে হাঁটতে থাক। না, না, ওরকম করে নয়। অমন করে কেউ হাঁটছে ভাবতে পার? গোড়ালি দুটো ভেতরে নাও, আঙুলগুলো বাইরের দিকে। এবারে—তোমার হাঁটু ভাঙছ না কেন? কোমর অমন শক্ত হয়ে আছে কেন? খেয়াল কর। তোমার দেহের ভারকেন্দ্র কোথায়? হাঁটতে জান না? অমন টলমল করছ কেন? আহা হা, দেখ কোথায় যাচ্ছ।

"ওরা দু-জন যত চেষ্টা করে টর্টসভ ততই গালাগালি করেন। আর ওঁর গালাগালি যত বাড়ে ততই ওদের আত্মবিশ্বাস কমে যায়। শেষ পর্যন্ত এমন হল যে ওরা কোন্‌টা পা আর কোন্‌টা মাথা, এ বোধ পর্যন্ত হারিয়ে ঘরের মাঝখানে থেমে গেল। নির্দেশকের দিকে তাকিয়ে দেখি একখানা রুমালের আড়ালে তিনি আপ্রাণ তাঁর হাসি লুকোবার চেষ্টা করছেন। তখন সবাই আমরা আসল ব্যাপারটি বুঝতে পারলাম।

"মেয়ে দু-জনকে টর্টসভ জিজ্ঞাসা করলেন: 'এবারে বুঝলে তো ঘ্যানঘেনে

সমালোচক একজন অভিনেতাকে কত উদ্‌ভ্রান্ত, কতখানি অসহায় করে তুলতে পারে ? সত্যকে খুঁজে পাবার জন্ত যতটুকু দরকার ততটুকুই মিথ্যাকে খুঁজবে। ভুলে যেয়ো না নির্দয় সমালোচক মঞ্চে যতখানি মিথ্যার সৃষ্টি করতে পারে ততখানি আর কেউ পারে না, কারণ যে অভিনেতাকে সে সমালোচনা করছে সে নিজেও অজ্ঞাতসারে সঠিক রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সত্যকে এমনভাবে অতিরঞ্জিত করে যে তা মিথ্যার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। নিজেদের মধ্যে এমন একজন সমালোচক তৈরি করবে যে প্রাজ্ঞ, ধীর এবং সহানুভূতিশীল। এমন সমালোচক শিল্পীর শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে উত্ত্যক্ত না করে যে তোমার অভিনয়ের সারাংশগুলো লক্ষ করবে।'

"আর-একটি কথা। তোমাদের সত্যানুভূতি দিয়ে প্রথমেই তোমরা ভাল দিকগুলো দেখবার চেষ্টা করবে। অন্যদের কাজ বিশ্লেষণ করবার সময় তোমাদের ভূমিকা হবে একখানি আয়নার। এবারে সৎভাবে বলবে যা তোমরা দেখলে এবং শুনলে তাতে তোমরা বিশ্বাস কর কিনা। বিশেষ করে যে মুহূর্তগুলো তোমাদের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে সেগুলো নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করবে।

"প্রসঙ্গত নির্দেশক অভিনয় এবং ভ্রমণের মধ্যে একটি সাদৃশ্যের উল্লেখ করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের কোন দীর্ঘ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে ? যদি থাকে তাহলে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে তোমাদের অনুভূতি এবং দেখা এ দুয়ের মধ্যে একের পর এক অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। মঞ্চের ব্যাপারটাও তাই। বাস্তবত যতই আমরা এগিয়ে যাই, দেখি প্রতিমুহূর্তে নতুন এবং ভিন্ন ঘটনা, ভিন্ন মেজাজ, ভিন্ন পারিপার্শ্বিক এবং প্রযোজনার বহিরঙ্গ। অভিনেতা নতুন মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনের অংশভাগী হয়।'

"এই কার্যক্রম সবক্ষেত্রে অভিনেতাকে নাটকের মধ্যে পুরোপুরি জড়িয়ে ফেলে। যাত্রাপথ তখন তার এমন সহজ হয়ে ওঠে যে তাকে পথভ্রষ্ট করা যায় না। তাই বলে এই পথটি কিন্তু তার ভিতরকার শিল্পীকে প্রবুদ্ধ করে না। নাটকটি তাকে জীবনের যে অন্তর্নিহিত পরিবেশে নিয়ে যায় সেই পরিবেশ তাকে অনেক বেশি আকৃষ্ট করে। তার ভূমিকায় যা-কিছু সুন্দর, কল্পনায় সেখানে যে পরিবেশ রচিত, এবং এগুলি তার মধ্যে যে অনুভূতির সঞ্চার করে, তাকে সে ভালবেসে ফেলে। ভ্রমণকারীদের মতো অভিনেতাও তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে অনেক রাস্তার সন্ধান পায় ; যেমন একদল তাদের ভূমিকাকে সমস্ত দেহ দিয়ে বুঝে এর বাইরের কাঠামোটিকে অভিনয়ে হুবহু তুলে ধরতে পারে ; আর একদল

নানা কলাকৌশলে নিজেদের সাজিয়ে নেয় এবং এমনভাবে অভিনয় করে যে পুরো ব্যাপারটা একটা কেনাবেচার মতো, আরেকদল অভিনয়ের নামে কেতাবি ঢঙে নিরস বক্তৃতা দেয় এবং অন্য একদল অভিনয়ের মাধ্যমে ভক্তবৃন্দের সামনে নিজেদের জাহির করে।

"ভুল পথে যাতে চলে না যাও তার জন্যে তোমরা কী করবে? তোমাদের পথের প্রতিটি জংশনে একজন করে পাকাপোক্ত, মনোযোগী, নিয়মানুবর্তী 'সিগন্যাল ম্যান'-এর ব্যবস্থা করবে। এই সিগন্যাল ম্যান হল তোমাদের সত্যানুভূতি, যা তোমাদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সহযোগিতা করে তোমাদের সঠিক পথে চালিয়ে নেবে।

"এর পরেই প্রশ্ন আসবে আমাদের পথ যে তৈরি হবে তাতে কী-কী উপকরণ থাকবে? প্রথমে মনে হতে পারে যে সত্যিকারের আবেগ ছাড়া আর কী আমরা ব্যবহার করতে পারি? অথচ আত্মিক উপকরণ কিন্তু যথেষ্ট কার্যকরী নয়। আমাদের কায়িক উপকরণও প্রয়োজন হয়।

"যা-হোক্, বাহ্যিক কার্যক্রমের চেয়েও যা বেশি দরকারি তা হল ঐ কার্যক্রমের নিহিত সত্য এবং সেই সত্যে আস্থা। কারণ যেখানেই সত্য এবং আস্থা আছে, সেখানেই তোমাদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে তোমরা খুঁজে পাবে। সাধারণ ছোট একটি ভূমিকায় একে পরীক্ষা করে দেখতে পার। ঐ ভূমিকায় যদি তোমাদের সত্যি বিশ্বাস থাকে, তবে দেখবে, এক মুহূর্তে স্বজ্ঞায় এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে একটি আবেগের সৃষ্টি হবে।

"যত স্বল্পস্থায়ী হোক্, এইধরনের মুহূর্তগুলিকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হয়! মঞ্চের অভিনয়ে, শান্ত সংঘাতহীন পর্বে যেমন, তেমনি নাটকীয় বিয়োগান্ত পর্বে এই মুহূর্তগুলির তাৎপর্য সমধিক। এর দৃষ্টান্ত খোঁজার জন্য খুব বেশি দূরে যাবার দরকার নেই। আজকের পাঠক্রমের দ্বিতীয় পর্বে তোমরা কী করছিলে ভেবে দেখ। ছুটে গিয়ে ফায়ার প্লেস থেকে এক বাণ্ডিল নোট তুলে আনলে, বোকা গবেট লোকটির জ্ঞান ফেরাতে চেষ্টা করলে, ডুবন্ত শিশুটিকে বাঁচাতে ছুটলে।

"এগুলো সবই তো বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডের একটা কাঠামো যার মধ্যে স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগতভাবে তোমরা তোমাদের অভিনীত চরিত্রের বাইরের জীবনটিকে গড়ে তুলতে চেয়েছ। এর আর-একটি দৃষ্টান্ত দিই। লেডী ম্যাকবেথ তাঁর ট্র্যাজেডির চরমপর্বে কী করছিলেন? খুব সাধারণ কাজ। তাঁর হাত থেকে রক্তের

-করছিলেন ? খুব সাধারণ কাজ। তাঁর হাত থেকে রক্তের একটা দাগ তিনি ধুয়ে ফেলছিলেন।"

"কালক্রমে তো তোমরা দেখবে যে বাস্তবজীবনেও আবেগের একটি বিরাট মুহূর্ত হয়ত কতগুলি সাধারণ, অকিঞ্চিৎকর, স্বাভাবিক কার্যকলাপে চিহ্নিত হয়। ভেবে দেখ, তোমাদের কোন প্রিয়জন রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুশয্যায়। একটি নিরতিশয় বিষাদের মুহূর্ত। তখন ঐ মুহূর্তে মৃত্যুপথযাত্রীর স্ত্রী বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু কী করছে ? ঘরে যাতে গোলমাল না হয় তার ব্যবস্থা করছে, ডাক্তারের নির্দেশ পালন করছে, রোগীর শরীরের তাপ নিচ্ছে, কম্‌প্রেস লাগাচ্ছে। মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে এই সব ছোট-ছোট কাজগুলো বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করছে।"

"শিল্পী হিশেবে আমাদের এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে ছোট-ছোট বাহ্যিক কার্যকলাপও যখন একটি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় তখন আমাদের আবেগকে প্রভাবান্বিত করে ঐ কার্যকলাপগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রক্ত ধুয়ে ফেলার কাজটি লেডী ম্যাক্‌বেথকে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করায় সাহায্য করেছিল। তার একক সংলাপের মধ্যে তোমরা যে দেখ ডানকান-এর মৃত্যুর স্মৃতি রক্তের একটি দাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বারবার ঘুরে-ঘুরে আসছে, সেটা নাটকের কোন আকস্মিকতা নয়। একটি ক্ষুদ্র বাহ্যিক ক্রিয়া এক প্রকাণ্ড আভ্যন্তরীণ তাৎপর্য সূচনা করছে, মনের একান্তে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছে তা একটি বাহ্যিক ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে।"

"কোন অভিনেতাকে যদি বলা যায় যে তার ভূমিকাটি নানা মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপ ও বিষাদের গভীরতায় পূর্ণ, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সে দুমড়ে ফেলবে, তার আত্মার চারপাশ খুঁড়ে-খুঁড়ে নিজের বোধকে সে প্রহারে জর্জরিত করে তুলবে। কিন্তু তাকে যদি দু-একটি সমস্যা দিয়ে বলা হয় এগুলি সমাধান করে বেশ আকর্ষণীয় আবরণে গুছিয়ে রাখতে, তাহলে কিন্তু নিশ্চিতভাবে কাজগুলি করতে সে লেগে যাবে ; যা করছে তাতে ব্যাপারটা মনস্তাত্ত্বিক, বিয়োগান্ত বা নাটক কোন্‌টা হল, এ সব নিয়ে একবারও সে আতঙ্কিত হবে না বা গুরুতর চিন্তায় আবিষ্ট হবে না।"

"আবেগকে এইভাবে বিচার করতে পারলে সবরকমের জবরদস্তি এড়ানো যায় এবং এর ফল হয় স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও সম্পূর্ণ। বড়-বড় কবিদের লেখায় দেখা যায় অতি সাধারণ ঘটনাকে ঘিরে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের ব্যঞ্জনা এবং তারই মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আমাদের আবেগকে উজ্জীবিত করবার নানা

প্রয়োজন।"

"খুব উঁচুতে উঠতে হলে অভিনেতাকে তার সৃজনশীলশক্তি যথাসম্ভব বাড়িয়ে তুলতে হয়। কাজটি শক্ত। আপন ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালনের স্বাভাবিক ক্ষমতা না থাকলে কী করে সে মননশীলতার ঐ পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে যেতে পারবে? সৃজনশীলতার যে শক্তিতে এই অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব তাকে জোর করে নিয়ে আসা যায় না। যদি কোন অস্বাভাবিক উপায় গ্রহণ কর তাহলে দেখবে তোমরা ভুল রাস্তায় চলে গেছ। সেখানে সহজাত আবেগের বদলে তোমরা নাটকীয় আবেগকে প্রশ্রয় দিয়েছ। সহজ পথটাই পরিচিত, বহুব্যবহৃত এবং যান্ত্রিক। সে পথে সবচেয়ে কম বাধা।"

"বিয়োগান্ত নাটকের ভূমিকায় নিজেকে তৈরি করবে স্নায়ুকে পীড়ন না করে, হতশ্বাস না হয়ে, কোন জবরদস্তি বা আকস্মিকতার আশ্রয় না নিয়ে। ধীরে-ধীরে, যুক্তিসংগতভাবে, বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের সঠিক প্রয়োগে, এবং এগুলিতে আস্থা রেখে এগোতে হবে। এইভাবে আবেগ প্রকাশের রীতিনীতিগুলি যখন যথাযথ আয়ত্ত করতে পারবে তখন বিষাদক্লিষ্ট মুহূর্ত সম্পর্কে তোমাদের মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে যাবে। এগুলি আর তোমাদের আতঙ্কিত করবে না।"

টর্টসভ-এর কথা শেষ হ'ল কিছুক্ষণের জন্য সবাই চুপচাপ। গ্রিশার তর্কে অরুচি নেই। তাই হঠাৎ সে বলে উঠল: "আমার কিন্তু মনে হয় শিল্পীরা মাটির উপরে ছুটে বেড়ায় না। মেঘের উপর উড়ে-উড়ে চলে।" অল্প হেসে টর্টসভ বললেন, "তোমার উপমাটুকু আমার ভাল লাগল। একটু পরে ও-ব্যাপারটায় আসছি।" আজ ক্লাসে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে আমি নিঃসংশয় হলাম। বাস্তবে এর প্রয়োগ দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। আমাদের এক সতীর্থ, ভাশা, ব্র্যাণ্ড (Brand) থেকে একটি দৃশ্য অভিনয় করল — পরিত্যক্ত শিশুর সেই দৃশ্যটি। সংক্ষেপে ঘটনাটি ছিল এইরকম · একটি মেয়ে বাড়ি ফিরে দেখে দরজার সামনে কেউ একটি শিশুকে ফেলে গেছে। প্রথমে সে ভয়ানক ভেঙে পড়ল। তার পর কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে সে ঠিক করে ফেলল শিশুটিকে সে পালন করবে। কিন্তু রুগ্ন শিশুটি তার কোলেই মারা গেল।

"এইধরনের দৃশ্য, যাতে বাচ্চাদের ব্যাপার রয়েছে, ভাশাকে খুব বেশি করে নাড়া দিত, কারণ ওর নিজের বিবাহিত জীবনে একটি শিশুকে ও হারিয়েছিল। কথাটা কানাঘুষায় আমার কাছে এসেছিল। কিন্তু আজ ঐ দৃশ্যে ওর অভিনয় দেখে কাহিনীটির সত্যতায় আমার কোন সন্দেহ রইল না। অভিনয়ে সর্বক্ষণ

ওর দু-চোখ বেয়ে জল পড়েছিল। যে কাঠের ছড়িখানিকে ও বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, গভীর মমতার অভিব্যক্তির ফলে সেখানি আমাদের কাছে একটি শিশুর রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তারপর যখন শিশুর মৃত্যুর মুহূর্তটি এল, ভাশার গভীর ভাবাবেগে অভিভূত অবস্থার পরিণাম চিন্তা করে নির্দেশক দৃশ্যটি থামিয়ে দিলেন।

"খুশি হয়ে টর্টসভ বললেন: "এবারে দেখলে তো প্রেরণায় কোন্ সৃষ্টি সম্ভব। এর জন্য কোন আঙ্গিকের দরকার নেই। প্রকৃতি নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন বলেই আমাদের শিল্পের রীতিনীতির সঙ্গে এমন নিশ্চিত সাযুজ্য ঘটে। কিন্তু ঠিক এমনটি রোজই হবে, এ তোমরা ধরে নিতে পার না। কোন একদিন ঐ বিশেষ প্রেরণা কাজ না-ও করতে পারে, আর সেদিন...

"ভাশা বলে উঠল : "না, না, নিশ্চয়ই করবে", আর, কথাটা বলে ফেলেই, পাছে প্রেরণার ব্যাপারটা হারিয়ে যায়, তাই সে দৃশ্যটি আবার শুরু করে দিল। প্রথমে ওর স্নায়ুর কথা ভেবে টর্টসভ ওকে থামাতে চাইলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ও নিজেই থেমে গেছে, কারণ কিছুতেই আর কোন কিছু করতে পারছে না।

"টর্টসভ বললেন : "এবারে তুমি কী করবে? দলের .য ম্যানেজার তোমাকে কাজ দেবেন তিনি তো চাইবেন যে শুধু প্রথম অনুষ্ঠানটি নয়, পরপর সবক'টি অনুষ্ঠানে সমান সার্থকতার সঙ্গে ঐ দৃশ্যটি তুমি অভিনয় করবে। কারণ, তা না পারলে প্রথম রাত্রির সার্থক অভিনয়ের পরেই নাটকটি বন্ধ হয়ে যাবে"

"ভাশা বলল : "না। একবার কেবল একটু অনুভব করতে পারলেই আমি ভাল অভিনয় করতে পারব।"

"বুঝতে পারছি তুমি সরাসরি তোমার আবেগের কাছে পৌঁছতে চাইছ। বেশ তো সে তো ভাল কথা। একই আবেগকে বারবার ফিরিয়ে আনবার এমন পাকাপোক্ত কোন ব্যবস্থা করতে পারলে নিশ্চয়ই চমৎকার হত সেটা। কিন্তু উচ্ছ্বাস বা হৃদয়বৃত্তিকে তো ঐভাবে বেঁধে ফেলা যায় না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতো তা গড়িয়ে যায়, আর সেই কারণে, তোমাদের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, আবেগ প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর কিছু পদ্ধতির প্রয়োজন।"

"এত আলোচনার পরও আমাদের ইবসেন-অনুরাগী সতীর্থ অভিনয়ে বাহ্যিক প্রক্রিয়া ব্যবহারের প্রয়োজনকে প্রবলভাবে অস্বীকার করল। অভিনয়ের বিভিন্ন রীতিপদ্ধতি একে-একে যাচাই করে কোনটাতেই সে পুরোপুরি খুশি হল-না। যতই সে চেষ্টা করতে লাগল, এড়া'তে চাইলেও, বাহ্যিক প্রক্রিয়ার ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রহণ করতে হল এবং টর্টসভ এ বিষয়ে তাকে সাহায্য

করলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ডাশা যাতে স্বচ্ছায় ও নিপুণভাবে একবার নিজে যা করেছে তার পুনরাবৃত্তি করতে পারে। এবারে সে অনেক ভাল করল। তার অভিনয়ে সত্যনিষ্ঠা এবং প্রত্যয় দেখা গেল। তবু সেই পুরনো অভিনয়ের কাছাকাছি কিছুতেই সে আর আসতে পারল না।

"তখন নির্দেশক তাকে বললেন: "সুন্দর অভিনয় হয়েছে তোমার, যদিও তোমার লক্ষ্য পাল্টে গেছে। আমি তোমাকে সত্যিকারের জীবন্ত শিশু নিয়ে অভিনয় করতে বলেছিলাম। পরিবর্তে তুমি যা করলে তাতে দেখলাম টেবিল-ক্লথে মোড়া কাঠের একটি প্রাণহীন ছড়ি। তোমার সব-কিছু এর সঙ্গে মানিয়ে নিলে। কাঠের ছড়িটিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করলে তুমি, কিন্তু একটি জীবন্ত শিশুর ক্ষেত্রে অনেক খুঁটিনাটির প্রয়োজন ছিল যা তুমি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলে। প্রথমবারে, কাঠের ছড়িটিতে কাপড় জড়াবার আগে, তুমি ওর ছোট্ট-ছোট্ট হাত আর পাগুলো ছড়িয়ে দিয়েছিলে, সত্যি-সত্যি তুমি যেন অনুভব করতে পারছিলে, গভীর মমতায় চুমু দিচ্ছিলে, গুনগুন করে কথা বলছিলে, চোখের জলের মধ্য দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে তুমি হাসছিলে। আশ্চর্য ভাল হচ্ছিল তোমার অভিনয়। কিন্তু এইমাত্র খুঁটিনাটি কাজগুলো তুমি বাদ দিলে। স্বভাবতই এমনটা হল, কারণ কাঠের একখানি ছড়ির না আছে হাত না আছে পা।"

"সেবারে ওর মাথায় কাপড় জড়াবার সময় বাচ্চার গালে যাতে চাপ না লাগে সে সম্পর্কে তুমি বিশেষ সতর্ক ছিলে। তারপর কাপড় জড়ানো শেষ হয়ে গেলে, ওকে তুমি দেখছিলে, তোমার সমস্তভঙ্গিতে ছিল অহংকার আর আনন্দ।"

"এবারে তোমার ভুল শুধরে নাও। ছড়ি দিয়ে নয়, সত্যিকার শিশু নিয়ে দৃশ্যটি আবার কর।"

প্রথমবারে নিজের অগোচরে যে কাজগুলো সে করতে পেরেছিল, অনেক চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ডাশা সচেতনভাবে সেগুলো স্মরণ করতে পারল। শিশুটির সত্য অস্তিত্ব সম্পর্কে যেই সে নিঃসন্দেহ হল অমনি তার চোখে জল এল। অভিনয় শেষ হলে নির্দেশক তাকে সাধুবাদ জানিয়ে বললেন যা তিনি শেখাতে চেয়েছিলেন ডাশার অভিনয়ে তার সার্থক উদাহরণ রয়েছে। আমি কিন্তু তখনও মোহমুক্ত হইনি; তাই বেশ জোর দিয়ে বললাম যে প্রথমবারের মতো একবারও ডাশা আমাদের তেমন করে আর অভিভূত করতে পারেনি।

"তাতে কিছু যায় আসে না", টর্টসভ বলে উঠলেন। "একবার জমি তৈরি হয়ে গেলে, অভিনেতার মনে আবেগ সঞ্চারিত হলে, যে মুহূর্তে সে কল্পনার

ইঙ্গিত পাবে সেই মুহূর্তে দর্শককে সে নাড়া দিতে পারবে।"

"মনে করা যাক ডাশার নিজের একটি ফুটফুটে বাচ্চা ছিল। তার ওপরে ওর আসক্তি ছিল প্রবল। তারপর, একেবারে হঠাৎ একদিন, মাত্র কয়েকমাস বয়স যখন, বাচ্চাটি মারা গেল। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা ওকে সান্ত্বনা দিতে পারে। এইভাবেই চলত যদি-না একদিন ভাগ্য ওকে দয়া করত; ওর দরজার গোড়ায় ওর নিজের বাচ্চার চেয়েও অনেক সুন্দর একটি শিশুকে ও হঠাৎ দেখতে পেল।"

তীর এবারে সরাসরি লক্ষ্য ভেদ করল। তাঁর কথা শেষ হতে-না-হতেই কাঠের ছড়িখানির উপর তীব্র কান্নায় ভেঙে পড়ল ডাশা। সে উচ্ছ্বাস তার প্রথমবারের উচ্ছ্বাসকে ছাপিয়ে গেল।

আমি দ্রুতপায়ে টর্টসভ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম যে না-জেনে তিনি ডাশার জীবনের এক করুণ জায়গায় আঘাত দিয়েছেন। শুনে চমকে উঠলেন টর্টসভ। দৃশ্যটি বন্ধ করবার জন্য সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চের দিকে এগোলেন। কিন্তু ডাশার অভিনয় দেখে সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন! কিছুতেই তাকে বাধা দিতে পারলেন না।

অনেক পরে টর্টসভ-এর সঙ্গে আমার আলোচনা হল। আমি বললাম: আপনি কি মনে করেন না এবারের অভিনয়ে ডাশা তার নিজের জীবনের সত্যি-কার বেদনা অনুভব করতে পারছিল? তা হলে ওর সার্থকতার পিছনে কোন বিশেষ রীতি বা পদ্ধতির অবদানকে মেনে নেওয়া যায় না। বরং বলা যায় এটা একটা আকস্মিক যোগাযোগ।"

টর্টসভ পাল্টা প্রশ্ন করলেন: "তুমি শুধু বল প্রথমবারে ডাশা যা করেছে তাকে শিল্প বলবে কিনা?"

"নিশ্চয়ই শিল্প", আমি স্বীকার করলাম।

"কেন?"

"কারণ স্বজ্ঞায় ব্যক্তিগত বেদনার কাহিনী তার স্মৃতিতে ফিরে এসে তাকে অভিভূত করেছে।"

"তাহলে দেখা যাচ্ছে একমাত্র সমস্যা হল এই যে আমার ইঙ্গিত ওকে সাহায্য করেছে; নিজে থেকে ও খুঁজে পায়নি। অভিনেতার স্মৃতিচারণ আত্ম-নির্ভর হোক্ আর অপরের সাহায্যপুষ্ট হোক্, এ দুয়ের মধ্যে সত্যিকার কোন পার্থক্য আমি দেখতে পাচ্ছি না। আসল কথা হল স্মৃতি, যাতে অনুভূতিগুলিকে

ধরে রাখতে পারে এবং আবেগের মুহূর্তে সেগুলিকে ফিরিয়ে আনতে পারে। তখন সমস্ত দেহ মন দিয়ে তাকে বিশ্বাস না করে তোমার উপায় নেই।"

মেনে নিয়েও আমি যুক্তি দেখাতে চাইলাম। বললাম: "আমার এখনো মনে হয় কোন বাহ্যিক প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা ডাশাকে নাড়া দেয়নি: দিয়েছে যা, তা হল আপনার ইঙ্গিত।"

"একবারও আমি অস্বীকার করছি না। কল্পনাপ্রবণ ইঙ্গিতের ওপর সবকিছু নির্ভর করে। কিন্তু কখন এটা করা দরকার সেটা জানতে হবে। ডাশার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার আগের ঐ কাহিনীটুকু যদি আমি বলতাম তাহলেও কি সে অমন করে অভিভূত হত।"

"ধর, সেই সময়, দ্বিতীয়বার অভিনয় করতে গিয়ে বিন্দুমাত্র আবেগ প্রকাশ না করে যখন সে কাঠের ছড়িটিতে কাপড় জড়াচ্ছিল, শিশুটির ছোট্ট-ছোট্ট হাত-পাগুলো দেখে-দেখে, ওগুলিতে চুমু খেয়ে, মনের মধ্যে তখনও তার কোন ভাবান্তর আসেনি, কাঠের ছড়িখানি ওর কল্পনায় সুন্দর জীবন্ত শিশু হয়ে ওঠেনি তখনও। আমি স্থির বিশ্বাস করি, সেই মুহূর্তে আমি যদি ইঙ্গিত দিতাম যে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় জড়ানো ঐ ছড়িখানিই তার সন্তান, তাহলে সেটা ওর ভাব-প্রবণতাকে আহত করত। হতে পারত তাতেও আমার ইঙ্গিত এবং ওর নিজের ব্যক্তিগত বেদনার যোগাযোগ ঘটায় ও কাঁদত, কিন্তু সে হত নিছক মৃত সন্তানের জন্য কান্না। ঐ বিশেষ দৃশ্যটিতে হারানোর ব্যথাকে ভুলিয়ে আনন্দের যে কান্না, সে কান্না কখনও আসত না।"

"ঠিক মুহূর্তটি অনুমান করতে পেরে আমি যে ইঙ্গিতটুকু দিলাম ওর করুণ-তম স্মৃতির সঙ্গে তার সাযুজ্য ঘটল। এর ফলেই অমন মর্মস্পর্শী অভিনয়ের সৃষ্টি হতে পারল।"

আর-একটি কথা আমার যাচাই করে নেবার ছিল। তাই জিজ্ঞাসা করলাম: "সত্যিসত্যি ডাশা কি তখন একটা সম্মোহিত অবস্থার মধ্যে ছিল না?"

"নিশ্চয়ই না", টর্টসভ জোর দিয়ে বললেন। "ডাশার একবারও এ ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মায়নি যে ঐ কাঠের টুকরোটি একটি জীবন্ত শিশুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিন্তু সে বিশ্বাস করেছে যে নাটকে বর্ণিত ঐ সম্ভাবনা তার নিজের জীবনে ঘটলে সেটা তাকে বিষাদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারত। তার মধ্যেকার মাতৃত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ, ভালবাসা তার চারপাশের পরিবেশ, এগুলিকে সে বিশ্বাস করেছে।"

"কাজেই বুঝতে পারছ যে শুধু একটা চরিত্র সৃষ্টি নয়, সৃষ্ট চরিত্র পুনরভিনয়ের জন্যও এই পদ্ধতি বিশেষ মূল্যবান্। এক সময়ে যে আবেগ তোমাকে নাড়া দিয়েছিল তাকে তুমি নতুন করে অনুভব করতে পারবে। তা না হলে যে কোন অভিনেতার প্রেরণাদীপ্ত একটি মুহূর্ত এক ঝলক দেখা দিয়েই চিরদিনের মতো হারিয়ে যেত।"

"আমাদের আজকের পাঠক্রমে বিভিন্ন ছাত্রের সত্যানুভূতির পরীক্ষা নেওয়া হল। প্রথম ডাকা হল গ্রিশাকে। তাকে বলা হল যে কোন একটি অভিনয় করে দেখাতে। গ্রিশা যথারীতি সঙ্গী হিসেবে সোনিয়াকে বেছে নিল। তাদের অভিনয় শেষ হলে নির্দেশক বললেন: "তোমাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অভিনয় নির্ভুল এবং প্রশংসনীয় হয়েছে। অত্যন্ত নিপুণ তোমাদের কলাকৌশল। অর্থাৎ বহিরঙ্গ যাতে নিখুঁত হয় তার জন্য তোমরা বিশেষ সতর্ক ছিলে।"

"তোমাদের বানিয়ে তোলা সত্য নানা রূপকল্প ও আবেগকে বোঝাতে সাহায্য করেছে। যে সত্যে আমি বিশ্বাস করি তা নিজেই রূপকল্প সৃষ্টি করে প্রকৃত আবেগকে আলোড়িত করে। খাঁটি সত্য আমাকে পেতেই হবে। তোমরা সত্যের আভাসমাত্র দেখতে পেলে খুশি হও। আমি চাই অকৃত্রিম প্রত্যয়। তোমরা তোমাদের দর্শকের আস্থাভাজন হতে পারার মধ্যে নিজেদের গণ্ডি টেনে নাও। তোমাদের দিকে তাকিয়ে তারা নিশ্চিন্ত থাকে যে সুপ্রচলিত অভিনয়-রীতি নিখুঁতভাবে তোমরা পালন করে যাবে। কোন মল্লবীরের শক্তিতে তাদের যে আস্থা, তোমাদের শক্তিতেও তেমনি। তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দর্শক-উদাসীন পথচারীর মতো। আমার কাছে দর্শক নিজের অজ্ঞাতসারে আমার সৃজনশীলতার সাক্ষী এবং অংশীদার হয়ে ওঠে। মঞ্চের জীবন একান্ত অন্তরঙ্গতায় তাকে টেনে এনে তার আস্থা অর্জন করে।"

এর উত্তরে কোন তর্ক না করে গ্রিশা কবি পুশকিনের দুটি লাইন উদ্ধৃত করল:

> **A host of lowly truths is dearer**
> **Than fictions which lift us higher than ourselves.**

"তোমার সঙ্গে এবং পুশকিনের সঙ্গে আমি একমত", টর্টসভ বললেন, "কারণ তিনি এমন গল্প-উপন্যাসের কথা বলছেন যাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি। ঐ গল্প-উপন্যাসে আমাদের বিশ্বাসই আমাদের ওপরে উঠিয়ে নেয়। মঞ্চে অভিনেতার কল্পিত জীবনে সবকিছু বাস্তব হয়ে ওঠা দরকার, এই দৃষ্টিভঙ্গির সার-

বস্তু এতে প্রমাণিত হয়। তোমাদের অভিনয়ে এটা আমি দেখতে পেলাম না।"

কথাগুলি বলে দৃশ্যটিকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তিনি পর্যালোচনা করলেন, অনেক ভুল শুধরে দিলেন, যেমন পুড়ে যাওয়া টাকার দৃশ্যে আমার অভিনয় নিয়ে করে-ছিলেন। তারপর, এমন একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে দীর্ঘ, মূল্যবান্ এক বক্তব্যের অবতারণা হল।

হঠাৎ গ্রিশা তার অভিনয় থামিয়ে দিল। রাগে তার মুখ কালো হয়ে গেল, তার ঠোঁট আর হাত কাঁপতে লাগল। খানিকক্ষণ নিজের মেজাজের সঙ্গে যুঝে শেষ পর্যন্ত সে ফেটে পড়ল। "মাসের পর মাস ধরে আমরা চেয়ারগুলো এখান থেকে ওখানে টানাটানি করছি, দরজা বন্ধ করছি, আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছি। এগুলো শিল্প নয়। এটা থিয়েটার, সার্কাস নয়। সার্কাসে শরীরের কসরৎ হয়, বুঝি। ট্রাপিজটাকে সঠিক মুহূর্তে ধরে ফেলা, কিংবা ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে ওঠা সেখানে সাংঘাতিক প্রয়োজনীয় ব্যাপার। তাই বলে আমি এ কথা মানব না যে কালজয়ী লেখকের দল তাদের সেরা কীর্তিগুলি সৃষ্টি করেছিলেন যাতে তাদের নায়কেরা শারীরিক কসরৎ নিয়ে মেতে ওঠে। শিল্প স্বাধীন। এর জন্য অবাধ ক্ষেত্র দরকার; আপনার ঐ তুচ্ছ বাহ্যিক সত্যের সেখানে কোন দাম নেই। গুবরে পোকার মতো মাটিতে হামাগুড়ি দেওয়ার বদলে অনেক বড় সংগ্রামের জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে।"

তার কথা শেষ হলে নির্দেশক বললেন: "তোমার প্রতিবাদ আমাকে বিস্মিত করেছে। এই মুহূর্ত পর্যন্ত তোমাকে আমি বাহ্যিক কলাকৌশলে অসাধারণ শিল্পী হিসেবে বিবেচনা করেছি। আজ হঠাৎ দেখছি তোমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য আকাশের মেঘ। বাহ্যিক অনুষঙ্গগুলি তোমার পাখা ছেঁটে দিয়েছে, আর তোমাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে কল্পনা, আবেগ এবং চিন্তা। তবু, আমার মনে হচ্ছে তোমার আবেগ ও কল্পনা এখানে এই প্রেক্ষাগারে বাঁধা পড়েছে। প্রেরণার হাল্কা মেঘ তোমাকে যদি ওপরে ভাসিয়ে নিতে না পারে তা হলে এখানে যে সব প্রাথমিক কাজগুলো করা হচ্ছে তার প্রয়োজন আর-সবার চেয়ে অনেক বেশি করে তুমি অনুভব করতে পারবে। অথচ মনে হচ্ছে ঐ কাজগুলোকে তুমি ভয় পাচ্ছ, অনুশীলনকে মনে করছ শিল্পীর পক্ষে অবমাননাকর।"

"একজন ব্যালেরিনা নিশ্বাসপ্রশ্বাসের অনুশীলন করে, শরীর থেকে যাতে ঘাম বেরোতে পারে তার জন্য পরিশ্রম করে, সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আগে প্রতিদিনের শরীরচর্চায় সে অভ্যস্ত হয়। গায়ককে মনপ্রাণ দিয়ে সন্ধ্যার আসরে

গাইতে হলে প্রতিদিন ভোরে চীৎকার করতে হয়, আনুনাসিক স্বরক্ষেপণ, কিংবা একটি স্বরকে ধরে রাখা, বুকের ডায়াফ্রামকে বাড়িয়ে তোলা, স্বরের নতুন ঝংকার খোঁজা, এগুলো নিয়মিত রেওয়াজ করতে হয়। এমন কোন শিল্পী নেই শরীর-যন্ত্রকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনকে যে বাতিল করে দিতে পারে।"

"তুমি কেন নিজেকে আলাদা করে তুলতে চাইছ? আমরা যখন আমাদের শারীরিক ও আত্মিক প্রকৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি তখন কেন তুমি শারীরিক দিকটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে চাইছ? কিন্তু তুমি চাও—খুব উঁচুদরের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা—প্রকৃতি তা নামঞ্জুর করেছে। পরিবর্তে তুমি পেয়েছ বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষমতা, যা তুমি দেখাতে পার।"

"খুব উঁচুদরের ব্যাপার নিয়ে যারা বেশি কথা বলে প্রায়ই দেখা যায় নিজেদের ওপরে তুলে নিয়ে যাবার মতো গুণ তাদের নেই। মিথ্যে উচ্ছ্বাস নিয়ে শিল্প ও সৃষ্টি সম্পর্কে তারা অস্পষ্ট একতরফা কথা বলে। সত্যিকার শিল্পী যখন কথা বলে তখন সেগুলো হয় সাদাসিধে, সহজবোধ্য এগুলো ভেবে দেখো, আর সেই-সঙ্গে মনে রেখো কিছু-কিছু ভূমিকায় খুব ভাল অভিনেতা হবার সম্ভাবনা তোমার রয়েছে।"

গ্রিশার পরে সোনিয়াকে পরীক্ষা করা হল। দেখে অবাক হলাম ছোটখাটো কাজগুলো সুন্দরভাবে সে করল। নির্দেশক তার প্রশংসা করলেন এবং একখানি কাগজকাটা ছুরি তার হাতে দিয়ে তাকে আত্মহত্যা করে দেখাতে বললেন। বাতাসে ট্র্যাজেডির গন্ধ পাওয়ামাত্র সে 'রণপা'তে উঠে দাঁড়াল এবং তারপর, চরম নাটকীয় মুহূর্তে এমন সাংঘাতিক চীৎকার শুরু করল যে আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

নির্দেশক তাকে বললেন: "হাসির দৃশ্যে তোমার সুন্দর অভিনয় আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে। কিন্তু কড়া নাটকীয় জায়গাগুলোতে তোমার অভিনয় বেসুরো পর্দায় বেজেছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তোমার সত্যের বোধ একপেশে। কমেডি তোমাকে বেশি আকৃষ্ট করে। গ্রিশা এবং তুমি দু-জনেই থিয়েটারে তোমাদের উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পাবে। আমাদের শিল্পে প্রতিটি অভিনেতা যাতে তার উপযুক্ত 'টাইপ' খুঁজে পায় তার খুবই প্রয়োজন আছে।"

এর পরে এল ভানিয়ার পালা। আমার ও 'মারিয়ার সঙ্গে টাক' পোড়ার দৃশ্যটি সে করল। আমার মনে হল প্রথমার্ধ এত ভাল সে আর কখনো করেনি।

নির্দেশের তার সুখ্যাতি করলেন। সেইসঙ্গে বললেন: "মৃত্যুর দৃশ্যে সত্যকে অনাবশ্যক অত অতিরঞ্জিত করে দেখালে কেন? তুমি দেখালে হাত-পায়ের খিঁচুনি, বমির চেষ্টা, গোঙানি, ভয়ংকর মুখবিকৃতি এবং ক্রমশ পক্ষাঘাত। মনে হচ্ছিল নিছক বাস্তবতার খাতিরে ওগুলো তুমি করছ। একটি মৃত্যুর বাইরের দিকগুলি, দৃশ্যমান্ স্থিতিগুলিতেই, তোমার আগ্রহ দেখা গেল।

"হাউপ্টমান-এর *Play of Hannele*-এ বাস্তবতার স্থান নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেখানে তার উদ্দেশ্য মূলত আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুর গুরুগম্ভীর মেজাজটিকে হাল্কা করে দেওয়া। এইরকম নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পাদনের প্রক্রিয়া হিশেবে নিশ্চয়ই আমরা একে গ্রহণ করতে পারি। এ ছাড়া, বাস্তবজীবনের নানান্ খুঁটিনাটিকে টেনে তুলে মঞ্চে নিয়ে যাবার কোন দরকার নেই।

"এর থেকে এই উপসংহারে আসা গেল যে সবরকমের সত্যকে মঞ্চে নিয়ে আসা যায় না। মঞ্চে যা আমরা ব্যবহার করি তা হল সৃজনশীল কল্পনায় সত্যের একটা কাব্যিক সাদৃশ্যে রূপান্তর।"

'পদ্ধতি' প্রসঙ্গ

সম্ভবত আমাদের দেশে থিয়েটারের আলোচনার ক্ষেত্রে হাসান সারওয়ার্দি সাহেব সর্বপ্রথম স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়শিক্ষার প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৩৪৩ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত আধুনিক নাট্যবিষয়ক একটি মনোজ্ঞ আলোচনায় স্তানিস্লাভস্কির 'মাই লাইফ ইন্ আর্ট' নামক বইটির কথা উল্লেখ করেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার এক বছর আগে স্তানিস্লাভস্কি মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে লেখাগুলির ইংরেজি অনুবাদ আমেরিকায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। ১৯২৪ সালে এবং ১৯২৬ সালে তাঁর দুটি বই প্রকাশিত হয়। জানি না সেইসময় এখানে ওই বইগুলো এসেছিল কিনা। এসে থাকলেও, সে নিয়ে আলোচনা বোধ করি শুরু হয়নি, বা সাধারণ নাট্যামোদীদের মধ্যে সেই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথাগুলি কোন আলোড়ন তুলেছিল কিনা তা-ও অজ্ঞাত। আমি তাই সারওয়ার্দি সাহেবকে স্তানিস্লাভস্কি সম্পর্কিত আলোচনার অগ্র-পথিক মনে করি।

আমার ধারণা স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের থিয়েটারে আগ্রহ নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গেই যুক্ত। অর্থাৎ গত ত্রিশ বছর। কিন্তু এখানকার থিয়েটারে বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারে কেমনভাবে সে তত্ত্বগুলি প্রযুক্ত হয়েছে তার কোন নথি নেই, কিন্তু যে সব গ্রুপে অভিনয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে— অভিনেতার স্ফুরণের জন্য ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করা হয়েছে, চরিত্রের গভীরতাকে প্রকাশ করবার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন—সে সব গ্রুপে জ্ঞাতসারেই হোক্ অজ্ঞাতেই হোক্ স্তানিস্লাভস্কির পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে নিঃসন্দেহে।

সম্প্রতি ব্রেখট্‌কে নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, তাঁর পদ্ধতি নিয়ে যত পরীক্ষা সরবে হয়েছে, স্বীকার করা ভাল, স্তানিস্লাভস্কি সম্পর্কে তেমন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আলোচনা বা নাট্যানুষ্ঠান হয়নি। তার কারণও আছে। স্তানিস্লাভস্কি চেয়েছিলেন একটা নতুন নাট্যাদর্শ, নতুন অভিনয়রীতি। শুধু চেয়েই ক্ষান্ত হননি। তাঁর অভিজ্ঞতাকে একটা বৈজ্ঞানিক প্রথায় বিশ্লেষণ করে তা লিপিবদ্ধ

করেছেন, কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় যা অনুশীলনযোগ্য।

ব্রেখট্ কাজ করেছেন জর্মান থিয়েটারের এক অবক্ষয়কে রোধ করবার জন্য। নাট্যাদর্শের বদলে তাঁর লক্ষ্য একটা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা। তাঁর লিখিত নাটক-গুলি তাঁর আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে।

ব্রেখট্-চর্চার প্রাবল্যে আমরা ধরেই নিলাম ব্রেখট্ ও স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়পদ্ধতি একেবারেই বিপরীত মেরুর। এই প্রসঙ্গে একজন সমালোচক হেলেনে হ্বাইগেল-এর অভিনয় দেখে লিখেছেন (মাদার কুরাজ) যে স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতিতে শিক্ষিত প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর মতোই তাঁর অভিনয়। ব্রেখট্ বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছেন। সেটা যতখানি দর্শকদের সম্পর্কে প্রযোজ্য ততখানি অভিনেতা-সম্পর্কিত নয়। যদিও অভিনেতা কীভাবে চরিত্র থেকে দূরত্ব আনবেন সে সম্পর্কে মহলাকালীন অভিনেতার ইতিকর্তব্যও তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে যদি কোন অভিনেতা আবেগ অনুভব করতে সক্ষম না হন, তাহলে আবেগ ভাঙবেন কেমন করে? প্রশ্ন ওঠে, যদি কোন অভিনেতা চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম না হন তাহলে চরিত্রের বাইরে আসার প্রশ্ন ওঠে কেমন করে? অর্থাৎ চরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করা এবং আবেগ সৃষ্টি করা পর্যন্ত স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতির সঙ্গে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু আমরা আমাদের অদ্ভুত মনোভাবের জন্য এই কথাগুলো ভুলে যাই। মাতামাতি করতে আমরা ভাল-বাসি কিনা!

চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্বে সাংহাই-এর বিপ্লবী গণ-সমালোচনা লেখকগোষ্ঠী কর্তৃক স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতি সম্পর্কে একটি নঞর্থক প্রবন্ধ আমাদের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রবন্ধের এক জায়গায় লেখা হয়েছে— "বহুকাল ধরে ক্রুশ্চভ, লিউ-শাও চি আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা সমাজতান্ত্রিক নাট্যতত্ত্বের ভেকধারী এই বুর্জোয়া নাট্যপদ্ধতিকে ব্যবহার করে এসেছে মার্কস-বাদ-লেলিনবাদের বিরোধিতা করার এবং পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ান থেকে এই পদ্ধতি হুহু করে চীনে ঢুকে পড়ে নাট্য ও সিনেমাজগতে আধিপত্য করে বসেছিল। পরিচালকরা, অভিনেতারা স্তানিস্লাভস্কির লেখা পড়ত এমন শ্রদ্ধাভরে যেন বাইবেল পড়ছে।" আমাদের স্তানিস্লাভস্কি সম্পর্কিত আগ্রহের উত্থান-পতন বোধহয় এইসব বাইরের নানান্ কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সম্প্রতি কলকাতায় পূর্ব জর্মানির প্রখ্যাত নাট্যপরিচালক ফ্রিট্স্ বেনোভিট্স্

এক আলোচনাসভায় বলেছেন যে ব্রেখট্ ও স্তানিস্লাভস্কির অনুরাগীদের মধ্যে একটা ভুলবোঝাবুঝি আছে। সেটা স্বীকার করে তিনি বলেন যে এ ভুল-বোঝা বাঞ্ছিত নয়। স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধাশীল এবং অভিনয় শিক্ষাদানে তাঁরটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। স্মরণ রাখা ভাল যে ফ্রিট্স্ বেনেভিট্স্ ব্রেখটীয় নাট্যরীতির একজন অভিজ্ঞ পরিচালক। এবারে বোধহয় স্তানিস্লাভস্কি সম্পর্কে আমরা পুনরায় উৎসাহিত হব।

আমেরিকার গ্রুপ থিয়েটারের মতো এখানে কোন একটি দল কেবলমাত্র স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতি নিয়ে অনুশীলন, সাধনা, হয়তো করেনি। কিন্তু এমন কিছু দল নিশ্চয়ই আছে যাঁরা এই পদ্ধতি বাড়াবাড়ি না-করেও প্রয়োগ করতে সচেষ্ট থেকেছেন। আলোচনাও হয়েছে এ দেশের কিছু পত্র-পত্রিকায়। 'বহুরূপী' পত্রিকায় বহুদিন যাবৎ প্রায় নিয়মিত অভিনয় সংক্রান্ত আলোচনায় স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়পদ্ধতির অনেকগুলি অংশ অনুবাদও নিয়মিতভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি 'এপিক থিয়েটারে'ও স্তানিস্লাভস্কি সম্পর্কে আলোচনা দেখেছি।

স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? আমরা জানি যে বার্লিনের মেসিং থিয়েটারে মাইনিংগাৎ ভ্রাতৃদ্বয় নাটুকেপনার বাড়াবাড়ি থেকে, বাক্‌বাহুল্যের হাত থেকে ম্রিয়মাণ নাট্যকলাকে উদ্ধার করবেন বলে সংকল্প নিয়ে কাজ শুরু করেন। বাস্তবিকতার পরিবেষ্টনে ফেলে নাট্যকারের অভিপ্রায়কে বাস্তব উপায়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা ছিল তাঁদের।

স্তানিস্লাভস্কি ও নেমিরোভিচ দানশেঙ্কো এই কর্মপ্রণালীতে অনুপ্রাণিত হয়ে মস্কোতে কাজ শুরু করেন। থিয়েটারের কাজের অভিজ্ঞতায় এঁরা দু-জনে অনুভব করলেন যে অভিনয়শিক্ষার একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত না হলে নাটককে রঙ্গালয়ের বাঁধা কথা ও সাধা প্রথার অত্যাচার থেকে মুক্ত করা অসম্ভব। এই সংকল্পে স্তানিস্লাভস্কি যে পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন রুশদেশে তা 'সিস্টেমা' নামে পরিচিত। এই অদ্ভুত নাট্যবেদ মনোবিজ্ঞানের ও অধ্যাপনাবিধির নতুন তথ্য-গুলিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং তিনি অভিনয়শিল্পে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের প্রয়োগ করেছেন।

এই পদ্ধতির সারকথা হচ্ছে অভিনেতার ব্যক্তিত্বকে ভূমিকার সাযুজ্যে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে নিয়ে নট ও নাটকের মধ্যে একটা মরমী সম্পর্ক স্থাপন করা। ভূমিকার সাযুজ্যে যে নট প্রাণ বিসর্জন করতে পারে কেবল সেই সত্য হয়ে ওঠে

চরিত্রের মধ্যে।

যে সমস্ত নাটকের ভাষা, অর্থাৎ সংলাপ প্রতিদিনের ভাষা, যেখানে চরিত্র অন্তর্মুখী, যেখানে সংলাপের পিছনে লুকিয়ে আছে অসংখ্য জটিলতা, প্রবল মানসিক দ্বন্দ্ব সেখানে এই পদ্ধতি একমাত্র সমাধান ভাল অভিনয়ের।

অনেকে বলেন স্তানিস্লাভস্কি অভিনেতার ব্যক্তিত্বকে অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে বিলীন করে দিতে বলে অভিনেতার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটার পথে বাধা দিয়েছেন। কথাটা সত্য নয়। অভিনেতার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ না ঘটলে সে কোন চরিত্রের মধ্যেই প্রবেশ করতে পারে না। "যদি আমি সত্যি এই চরিত্র হতাম" —এ কথা বলতে পারে কেবলমাত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী শিল্পী। ব্যক্তিত্বহীনরা নয়। 'আমি সে হলে'—এইরকম করে কথাগুলো বলতাম। অতিকৃত অভিনয়ের প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই আশ্চর্য সুন্দর জটিল মানুষ। আমার মধ্য দিয়েই দর্শক সেই চরিত্রকে দেখতে পাবে।

স্বভাবসিদ্ধ অভিব্যক্তি, ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক সত্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং নাট্যকারের অভিপ্রায়কে দেহলীলার মধ্যে মূর্ত করে তোলা —আধুনিক নাটাকলার এই ক'টি লক্ষণই মস্কো আর্ট থিয়েটারের চিরস্থায়ী দান। নাট্যশিল্পকে মনোবিজ্ঞানের আসনে বসান ছাড়া ঐ থিয়েটারের অন্য কীর্তি হচ্ছে অভিনেতাকে নির্দিষ্ট কর্মধারার গণ্ডি থেকে মুক্ত করা। সাবেকী নিয়মে অভিনেতা বিশেষ একধরনের ভূমিকায় আবদ্ধ থাকত।

প্রাচীন ও অর্বাচীন নাট্যবিশারদদের সঙ্গে স্তানিস্লাভস্কির পার্থক্য হল এই যে প্রাচীনদের ধারণা ছিল, আগে থেকে কাগজে নক্শা করে নাট্যমঞ্চকে ভিন্ন-ভিন্ন নটগোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু স্তানিস্লাভস্কি স্বাভাবিক প্রযোজনায় আস্থাবান্। এই প্রযোজনা নটসমবায়ের একাত্মবোধ থেকে উৎপন্ন। অভিনেতাকে তার পারিপার্শ্বিক বুঝিয়ে দিয়ে তার কল্পনা সতেজ করে তুলে, তার আবেগের উৎসমুখ খুলে দিতে সাহায্য করে। একটা চরিত্রকে সজীব করে তুলতে সাহায্য করাই স্তানিস্লাভস্কির সাধনা।

স্তানিস্লাভস্কি তাঁর পদ্ধতিতে 'সত্য' এবং 'ঘটনা'কে আলাদা করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রায় আরিস্ততলের ভঙ্গিতে বলেছেন: 'আমরা যা ঘটছে বা ঘটে তা নিয়ে মাথা ঘামাব না—আমরা আগ্রহী যা ঘটতে পারত তাই নিয়ে। অভিনয় সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত 'ম্যাজিক ইফ' এই সত্যকে স্বীকার করে নেবার শিক্ষা। যদি এইরকম ঘটনা ঘটত, এইরকম একটা পরিবেশে—তাহলে অভি-

নেতার কী প্রতিক্রিয়া হত সেটা কল্পনা করে নিয়েই অভিনয় করার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সত্য হল একটা কল্পনাদিয়ে তৈরি বাস্তব। সবরকমের সত্যকে মঞ্চে নিয়ে আসা যায় না। মঞ্চে যা আমরা ব্যবহার করি তা হল সৃজনশীল কল্পনায় তৈরি সত্যের একটা কাব্যিক সাদৃশ্যে রূপান্তর।

স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতির শক্তি হল যে এ-সাদৃশ্য কখনো বানিয়ে-তোলা নয়। আবিষ্কারও নয়। এই পদ্ধতি প্রাকৃতিক অনুশাসনের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় শিশুর জন্ম, গাছের বেড়ে ওঠা, শিল্পীর সৃষ্টি—এর সবকিছুর মধ্যেই এর প্রকাশ। তিনি বলেছেন সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন একটি রীতিতে নতুন করে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। সৃষ্টির সহজাত শক্তি নিয়ে আমরা পৃথিবীতে আসি, কাজেই স্বাভাবিক রীতি ছাড়া এর প্রকাশ কীভাবে সম্ভব জানি না। স্তানিস্লাভস্কি বিশ্বাস করতেন অভিনেতা ও অভিনেয় চরিত্রের যৌথ অনুভূতি তার অবচেতন মনের সৃষ্টি। এগুলিকে যথেচ্ছ জাহির করা যায় না। অনুভব করা যায় মাত্র। এদের প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সম্ভব। তিনি আরও বলেছেন, "মনে রাখবে আমাদের পদ্ধতি তোমাদের জ্ঞানের অভিধান—দর্শন নয়। যেখানে দর্শনের শুরু সেখানে অভিধানের শেষ।"

এই পদ্ধতি প্রথমে শিক্ষার্থীকে মঞ্চের ওপর নাট্যঘটনার সত্যতা, কল্পনা, কার্যকারণের যুক্তি খুঁজে বের করে তার ভাবাবেগ সম্পর্কে নিজেকে অত্যন্ত খাঁটিভাবে ব্যবহার করতে শেখায়। শিক্ষার্থী নানাভাবে নিজের শিল্পে বুদ্ধিকে আবিষ্কার করতে শিখবে এবং কোন কিছু অনুমান বা অনুকরণ করে প্রত্যেকবার নতুন করে প্রয়োজনীয় ভাবাবেগকে সৃষ্টি করবে। এই হল এই পদ্ধতির শিক্ষার অন্তর্গত ব্যাপার। এটাই অবশ্য শেষ কথা নয়। শেষ কথা অভিনেতার নিজের কাছে অভিনেয় চরিত্রকে সত্যি করে ব্যাখ্যা করে বুঝে নেওয়া যে নাট্যকার চরিত্রটির মধ্যে কী বোঝাতে চাইছেন বা নাট্যকারের কোন্ উদ্দেশ্য এর দ্বারা সাধিত হচ্ছে।

যে অনুশীলন দ্বারা ব্যক্তিত্ববন্ধন থেকে অভিনেতার মুক্তি সম্ভব তিনি তার নাম দিয়েছেন 'এতুদ'—অর্থাৎ সাধনাভ্যাস। তিনি বলেছেন, "জনসাধারণের চোখের সামনে অভিনেতার চারপাশে যে পরিবেশ রচিত হয়, তা স্বাভাবিকতার বন্ধন থেকে অভিনেতাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চেষ্টা করে। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য হল অভিনেতাকে সেই পরিবেশ থেকে মুক্ত করে স্বাভাবিক মানুষের সৃষ্টিশীল সুস্থ পরিবেশের মধ্যে ফিরিয়ে আনা।" —এই বাঞ্ছিত ফললাভের

জন্য তিনি সারাজীবন কাজ করেছেন—অভিনয়শিক্ষা দিয়েছেন। অভিনেতা তৈরি করেছেন। তাঁর পদ্ধতিতে অভিনেতাদের অনুশীলনও আয়াসসাধ্য, সময়সাপেক্ষ। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে যে কোন রমণী যদি তার দেহসৌষ্ঠব ও গমনগরিমার গুণে লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকার জন্য নির্বাচিত হয় তবু প্রথমেই তাকে শেক্সপীয়ারের পঙ্‌ক্তিগুলি আবৃত্তি করতে দেওয়া হয় না। শুরুতে প্রযোজক সূচিত কতকগুলি দৃশ্যে সে নিজের আচার-ব্যবহারকে আয়ত্ত করে নেয়। এই দৃশ্যগুলোর সঙ্গে মূল নাটকের কোন সম্পর্ক থাকে না, কেবল কতকগুলি প্রাত্যহিক অবস্থার মধ্য দিয়ে সে দেখায় প্রকৃতপক্ষে লেডী ম্যাক্‌বেথ হলে সে কী করে দরজা খুলত, শুতে যেত, জানালা দিয়ে মুখ বাড়াত। শিক্ষক যদি এতে সন্তুষ্ট হন তবেই সে আসল নাটকে প্রবেশাধিকার পাবে। এর পর শেক্সপীয়ারের সংলাপ। মস্কো আর্ট থিয়েটারে যখন কোন নাটক নির্বাচিত হত তখন সাহিত্যিক ও শিল্পগত আদর্শের দিকে নজর রাখা হত। মহলা শুরু হবার আগে পরিচালক দিনের পর দিন নাটকখানির ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবেষ্টন কী এবং কোন মানসিক প্রশ্নের ওপর তা প্রতিষ্ঠিত সে সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তার পর ভূমিকা পাঠ। এ সময় কোনরকম অভিব্যক্তি অঙ্গবিক্ষেপ নিষিদ্ধ। কয়েকটি বৈঠকের পর অভিনেতাদের মুখেচোখে ফুটে ওঠে ভেতরের আবেগের প্রতিভাস। আরম্ভ হয় অভিনেতাদের আসল মহলা। পরিচালক তখন পরস্পরের ব্যবধান, পরস্পরার অঙ্গরেখা, হাবভাবের সংকল্প ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দেন। মনে রাখা ভাল যে, স্তানিস্লাভস্কি নিজে কাজ শুরু করেছিলেন 'প্রডিউসার অটোক্র্যাট্‌' হিসেবে, কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং সচেতনতা তাঁকে গড়ে তুলল 'প্রডিউসার ইনস্ট্রাক্টার'। প্রযোজনার ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করেছিলেন বাস্তবনিষ্ঠ স্বাভাবিকতা নিয়ে, কিন্তু অবশেষে দেখতে পাওয়া যায় এই স্বাভাবিক সত্যের সীমাবদ্ধতায় তিনি ক্লান্ত। তিনি তাই বলেছেন, "after wandering about in search of new ways, we shall again return to realism for more strength",—এ কোন্ বাস্তবতা ? উত্তরে বলেছেন, "refined and deeper realism."

বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গ

ব্রেখট্ থিয়েটারের একটা নবরূপ কল্পনা করেছিলেন। এবং সেইসঙ্গে একটা নতুন অভিনয়ভঙ্গির কথা তিনি বলেছেন। তাঁর অভিনয়তত্ত্ব বুঝতে গেলে এই নতুন চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতটাও জানতে হবে। থিয়েটার সম্পর্কে ব্রেখটের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য এরই সঙ্গে বিচার্য। বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর অভিনয়প্রণালী উদ্ভট মনে হতে পারে। ব্রেখট্ যে জর্মন সমাজে বেঁচেছিলেন এবং কাজ করে-ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত—সেখানকার শিল্প, সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা—তাঁর চিন্তা ও কর্মপ্রণালী নির্ধারণ করতে ও মতামত গঠন করতে মিলিতভাবেই সাহায্য করেছে। অবশ্য ব্রেখটের চিন্তা একটা প্রতি-ক্রিয়ার ফল বলেও অনেকে মনে করেন। থিয়েটারের সঙ্গে জীবনের এবং সমাজের যোগ সেই প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। জীবন-বিরহী এ-শিল্প কোনদিনই ছিল না। কিন্তু ইতিহাসের কিছু-কিছু পর্বে থিয়েটারের এই চরিত্র-লক্ষণ ব্যাহত হয়েছে। থিয়েটারে আনন্দ এবং শিক্ষা এই দুটো লক্ষ্য সোচ্চার না হয়েও চিরকাল থিয়েটারে পরিলক্ষিত হত। এবং ইওরোপে নানান্ মত ও পথ কখন নাট্যকারের চিন্তায় কখন থিয়েটারের প্রযোজক নির্দেশকের চিন্তায় বিভিন্ন খাতে চললেও একটা সাধারণ লক্ষ্য স্থির ছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ব্রেখট্ তাঁর দেশের পরিস্থিতির মধ্যে উপলব্ধি করলেন সে-লক্ষ্য থিয়েটার ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ছে—এ-বিশ্বাস ব্রেখটের দৃঢ় হল। সেই পরিস্থিতিতে ব্রেখট্ দেখলেন যে এক্সপ্রেশনিজম্ নাট্য-কলাকে সমৃদ্ধ করেছিল তা ক্রমশ আলো দানে অক্ষম হয়ে পড়ল। থিয়েটারে যে নীতি ছিল তা থেকে ভ্রষ্ট হল। যান্ত্রিক কলাকুশলতায় সমৃদ্ধ থিয়েটার ক্রমশ এমন এক অভিনয়ের জন্ম দিল যে মোহসৃষ্টিকারী—যা অভিজ্ঞতার আলো দান করে না; যা কেবল নেশা ধরায়, ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে কিন্তু আর প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে পারে না।

এই বিশেষ অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় ব্রেখট্‌কে ভাবতে হল নতুন পথের কথা।

তিনি 'এপিক' থিয়েটারকে ভূষিত করলেন 'নন্ এ্যারিস্টোটেলিয়ান' এই আখ্যায়। তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতির মূল সুর বিদ্রোহ। অর্থাৎ ইওরোপের নাট্যধারার বিবর্তনে ক্লাসিকাল থিয়েটারের যে স্বীকৃত লক্ষ্য তারই বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হল ব্রেখটের 'না-মানা', 'নেতি', 'ncn' ইত্যাদি শব্দগুলো। এই প্রসঙ্গে ইওরোপের প্রথাগত থিয়েটারের অভিনয়রীতি কী ছিল সেটা জানলে ব্রেখটের অভিনয়রীতি বুঝতে তা সাহায্য করবে।

সেই ক্লাসিকাল থিয়েটারে উদ্দেশ্য ছিল দর্শকদের এমনভাবে আবেগাপ্লুত করে তুলতে হবে যাতে দর্শকমণ্ডলী অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। অভিনীত চরিত্রের শোক, দুঃখ, ভয় ইত্যাদি আবেগ নিজের শোক দুঃখ ভয় বলে গ্রহণ করে এবং অভিনীত চরিত্রের অনুভূতির সঙ্গে নিজের অনুভূতিকে বেমালুম মিলিয়ে নিয়ে মনের রুদ্ধ শোকতাপ নির্গলিত করে, মনকে পরিশুদ্ধ ও মার্জিত করে তুলতে পারে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে আবেগমোক্ষণ। সে ধারায় অভিনয়কে সফল বলা হত তখনই যখন দর্শক অভিভূত, বিহ্বল হয়ে গিয়ে অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যেত। আবার যে স্বভাববাদী অভিনয়রীতি পরবর্তীকালে থিয়েটারে দেখা দিল, তাতে মঞ্চে যা কিছু ঘটছে সেটা যেন এই মুহূর্তেই ঘটেছে এবং যা ঘটছে তা যেন সত্য। দর্শক যেন লুকিয়ে দেখে ফেলছে নানা লোকের কাণ্ডকারখানা আর আড়ি পেতে শুনে ফেলছে তাদের কথাবার্তা। এই যে দর্শকের নিজেকে ভুলে যাওয়া, অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হওয়া বা মঞ্চের স্বাভাবিকতা বা বাস্তবিকতায় ঘটনাকে সত্য রূপে গ্রহণ করা এটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবং অভিনয়রীতিতে হয় আবেগের বাহুল্য অভিভূত করে দিত কিংবা অভিনেতা অভিনীত চরিত্রে রূপান্তরিত হত। এই পদ্ধতিতে অভিনেতাকে এমনভাবে মনে-প্রাণে, ভাবে-ভঙ্গিতে অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে হত যাতে সে নিজেই ভাবে যে সে-ই হ্যামলেট, আলমগীর বা যোগেশ।

এই যে আবেগবাহুল্য, স্বাভাবিকতার ওপর ঝোঁক, স্থান কাল অনুযায়ী পরিবেশ আর দর্শক-নিরপেক্ষ অভিনয়—এই ধারা ইওরোপীয় থিয়েটারের বিবর্তনের দুটি বিশিষ্ট ধারা। দর্শককে ভাবাবেগে ভাসিয়ে নিয়ে তাকে পরি-শোধন করার প্রয়াস—এই হল সেই থিয়েটারের উদ্দেশ্য। ব্রেখট্ বললেন এ সমস্তই ভুল, এর উদ্দেশ্য ভুল, পন্থা ভুল, শুধু ভুল নয় মারাত্মক ভুল।

ব্রেখট্ বললেন, বাস্তব অভিজ্ঞতার যে প্রতিক্রিয়া দর্শককে তার থেকে,

অভিনীত নাটক থেকে, বিযুক্ত রাখতে হবে। থিয়েটার দেখার সময় যদি মোহের সৃষ্টি হয় তাহলে তা ভেঙে দিতে হবে। থিয়েটার দেখতে গিয়ে দর্শকের যেন মনে না হয় অভিনীত নাটকে যা ঘটছে তা সব সত্য ঘটছে—এই মুহূর্তে ঘটছে। দর্শক থাকবে নির্লিপ্ত, অসম্পৃক্ত। তাকে তা থাকতে হবে তার কারণ তার বিচারশক্তি সচেতন ও জাগ্রত রাখতে হবে। তার কাজ হবে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে সামাজিক ও তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের বিচার করা। অভিনীত নাটক থেকে দর্শকের এই আলাদা হয়ে থাকাই ব্রেখটের বিখ্যাত এলিয়েনেশন তত্ত্ব।

এপিক থিয়েটারের আদর্শ অনুযায়ী অভিনেতার কাজ হবে একটা বিগত ঘটনায় জড়িত একটি লোকের কাহিনী বর্ণনা করা। ব্রেখটের "অভিনয়ে বিচ্ছিন্নতা আনতে সহায়ক একটি পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধের অনুবাদ আশা করি জিজ্ঞাসু পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করবে।

"এমন একটি অভিনয়পদ্ধতির কথা এখন বলছি যা কিছু-কিছু মঞ্চে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল মঞ্চের ঘটনাগুলোকে মেনে নিয়েও দর্শক যেন বিচ্ছিন্ন থাকে। দর্শকদের মধ্যে ঘটনাটির প্রতি একটা সন্ধানী ও সমালোচনামূলক মনোভাব গড়ে তোলাই হল 'এলিয়েনেশন এফেক্ট' নামে পরিচিত এই প্রয়োগ-পদ্ধতির উদ্দেশ্য। এবং এই উদ্দেশ্যসাধনের উপায়গুলি ছিল শিল্প-সম্মত।

এলিনিয়েনেশন এফেক্ট এই উদ্দেশ্যে প্রয়োগের প্রথম শর্তই হল মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহ হবে 'ঐন্দ্রজালিক' সবকিছু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; তা ছাড়া, কোনপ্রকার মোহকর প্রভাব সৃষ্টি করা হবে না। এর ফলে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল মঞ্চে কোন নির্দিষ্ট একটি স্থানের পরিমণ্ডলকে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা (যেমন, সন্ধ্যা-কালীন একটা ঘর, শরৎকালের একটা রাস্তা) অথবা সংলাপের গতিময়তাকে শিথিল করে কোন আবহাওয়া সৃষ্টি। দর্শক আর প্রকৃতিগত মেজাজের প্রকা-শের দ্বারা মেতে উঠল না কিংবা সন্নদ্ধ পেশল অভিনয়ের প্রভাবে ভেসে গেল না। সংক্ষেপে বলা যায়, মঞ্চে কোন চেষ্টাই করা হল না মোহ সৃষ্টি করার এবং সাধারণ অপরিশীলিত ঘটনাকে দেখার ভ্রান্তি সৃষ্টি করার। এক্ষুণি আমরা দেখাব যে এ ধরনের ভ্রান্তির কাছে দর্শকের নিজেকে সঁপে দেবার প্রবণতা রোধ করতে হবে কিছু সুনির্দিষ্ট শিল্পসম্মত উপায়ের দ্বারাই।

এলিয়েনেশন এফেক্ট সাফল্যলাভ করার প্রথম শর্ত হল এই যে অভিনেতা যা অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চায় সেটাকে সুনির্দিষ্ট প্রকাশের ভঙ্গিতে

রূপায়িত করতে হবে। অবশ্যই এর জন্য বেছে বাদ দিতে হবে দুটো জিনিস : প্রথমত, এমন ধারণা যে একটা চতুর্থ দেওয়াল দর্শককে মঞ্চের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, কিংবা, দ্বিতীয়ত, এর ফলস্বরূপ ভ্রান্তি যে মঞ্চের কার্যকলাপ বাস্তবেই ঘটছে এবং তা-ও দর্শকের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করেই। এ-রকম মেনে নিলে, নীতিগতভাবে অভিনেতার পক্ষে দর্শকের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা বলা সম্ভব।

এটা ভালভাবেই জানা যে মঞ্চ ও দর্শকের মধ্যে যোগাযোগ স্বাভাবিকভাবে নিগূঢ় সমানুভূতির (empathy*) ভিত্তিতেই হয়। এই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারটাকে আয়ত্তে আনার জন্য প্রথাসিদ্ধ অভিনেতারা এত বেশি প্রচেষ্টা চালান যে মনে হয় শিল্পকলার এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে তাঁরা অনুমান করেন। আমাদের প্রারম্ভিক আলোচনার মধ্যে এটা বোধহয় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এলিয়েনেশন এফেক্ট সৃষ্টির পদ্ধতি নিগূঢ় সমানুভূতি সৃষ্টির পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। যে অভিনেতা এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সে নিগূঢ় সমানুভূতি সৃষ্টির চেষ্টা করতেই পারে না।

তবু, কতকগুলো নির্দিষ্ট চরিত্র উপস্থাপনার জন্য এবং তাদের ব্যবহার দেখাতে গিয়ে অভিনেতাকে নিগূঢ় সমানুভূতির নিয়মগুলি সম্পূর্ণ বর্জন না করলেও চলতে পারে। সে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে ঠিক একজন বিশেষ অভিনয়দক্ষতাহীন স্বাভাবিক লোকের মতো যে অন্য একজনের চরিত্র পরিস্ফুট করতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ সে 'লোকটার ভাবভঙ্গি দেখাতে ইচ্ছুক। অন্যের ভাবভঙ্গি প্রদর্শনের এমন ঘটনা প্রাত্যহিক জীবনে বারেবারেই ঘটে (কোন একটা দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা যেমন একজন নবাগতের কাছে হতভাগ্যের ভাবভঙ্গি, ইত্যাদি অঙ্গভঙ্গি ক'রে বর্ণনা করে, কিংবা, মজাদার একটা লোক বন্ধুর চলার ভঙ্গি অনুকরণ করে দেখায়, ইত্যাদি), কিন্তু এইসব প্রকাশভঙ্গি যারা করে তারা কিন্তু দর্শকদের মোহাচ্ছন্ন করার চেষ্টা করে না বিন্দুমাত্র। একই সঙ্গে, প্রদর্শিত চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য আয়ত্তে আনার উদ্দেশ্যে এগুলোকে বোঝবার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

আগেই বলা হয়েছে, অভিনেতাকেও এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োগরীতিকে কাজে লাগাতে হবে। মঞ্চে সাধারণ নিয়ম হল : দর্শককে অনুরূপ রীতিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অভিনেতাকে এ কাজটা করতে হবে অভিনয়ের সময়েই; কিন্তু এ ক্ষেত্রে অভিনেতাকে এই দক্ষতা অর্জন করতে হবে আরো পূর্ববর্তী একটা ধাপে এবং তালিম নেবার কোন একটা পর্যায়ে।

তীব্রভাবে 'আবেগপ্রবণ', সংযমহীন এবং সমালোচনাহীন চরিত্র এবং

ঘটনা স্মৃষ্টি রোধ করার জন্ত স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি পঠনের তালিমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অপরিণত অবস্থায় নিজের চরিত্রে যেতে ওঠার থেকে চরিত্রাভিনেতা যে-কোন অবস্থায়ই বিরত থাকবে এবং যতদিন সম্ভব একজন পাঠক হিসেবেই কাজ করে যাবে। তার মানে এই নয় যে সে জোরে-জোরে পড়বে)। নিজের প্রথম ধারণাগুলিকে মুখস্থ করে রাখা হল একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নিজের অভিনয়ের অংশটুকু পড়বার সময় অভিনেতার দৃষ্টিভঙ্গি হবে এমন-একজনের যে বিস্ময়বিমূঢ় এবং সবকিছুতেই প্রতিবাদ করে। তাকে নিখুঁত-ভাবে পরিমাপ করতে হবে শুধুমাত্র সেই সব ঘটনাগুলিই নয় যার সম্বন্ধে সে পড়ছে, পরন্তু তার অভিজ্ঞতায় লব্ধ অভিনীত চরিত্রটির আচারব্যবহার পর্যন্ত। কোন কিছুই ধরে নিলে চলবে না: এ ঘটনাটা এভাবে ঘটতই, কিংবা এমন ব্যাপার এ ধরনের চরিত্রের কাছ থেকেই আশা করা যায়—কোন কিছুই এভাবে ধরে নেয়া চলবে না। সংলাপ মুখস্থ করার আগে তাকে মুখস্থ করতে হবে যে-ঘটনাগুলো তাকে বিমূঢ় করেছিল, তাকে মনে রাখতে হবে কোন্-কোন্ স্থানে সে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতে চাইছিল ভীষণভাবে। কেননা এ সব জঙ্গম শক্তিকে অভিনয়ের মাধ্যমে সৃষ্টির জন্ত তাকে বজায় রাখতেই হবে।

মঞ্চে এসে অভিনেতা তার নির্দিষ্ট আসল কাজটুকু ছাড়াও সমস্ত জরুরী মুহূর্তে আবিষ্কার করবেন, নির্দেশ করবেন এবং অপারে বুঝিয়ে দেবেন কী-কী কাজ তিনি করছেন না। তার মানে অভিনেতাকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে তার কাজের পরিবর্ত ব্যাপারটাও যতটা সম্ভব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তার অভি-নয় সত্বেও অন্যান্য সম্ভাবনাগুলি বোঝা যায় এবং তার অভিনয় অনেকগুলি বিভিন্ন সম্ভাবনার একটি বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন, সে বলবে: 'তোমাকে এজন্ত শাস্তি পেতে হবে'; সে কখনেই বলবে না: 'আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম'। সে তার সন্তানদের ঘৃণা করবে; ঘটনাটা এমন হবে না যে সে তাদের ভালবাসে। মঞ্চের পিছনের ডান দিকে না গিয়ে সে মঞ্চের সামনের বাঁ দিকে যাবে। সে যা করছে তার মধ্যেই নিহিত এবং অটুট থাকবে সে যা করছে না সেই সব কাজ। এভাবে প্রত্যেকটি বাক্য এবং প্রত্যেকটি কাজ একটা মীমাংসার দ্যোতক হয়ে উঠবে; চরিত্রটিকে সবসময় চোখে-চোখে রাখতে হবে এবং পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই সমস্ত পদ্ধতির প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্য হল: "fixing the 'not'-'but.'"

যে চরিত্র সে মঞ্চে রূপদান করছে তার মধ্যে অভিনেতা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করতে পারে না। সে লিয়র, হারপাগন, শোয়াইক নয়; সে এদেরকে দেখায়। যতটা সম্ভব বিশ্বাসযোগ্যভাবে সে তাদের মন্তব্যগুলির পুনরুল্লেখ করে; সবচেয়ে বেশি আত্মনির্ভরতা এবং মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞান নিয়েই সে এদের ভাব-ভঙ্গির ধরনটিকে দেখায়, কিন্তু এর দ্বারা সে কখনই নিজেকে (কিংবা অন্যকে) ভোলাতে চেষ্টা করে না যে তার সমস্ত কর্মের ফলশ্রুতি হল সম্পূর্ণ রূপান্তর। আমি একটা দৃষ্টান্ত দেব যার অর্থ সব অভিনেতাই উপলব্ধি করতে পারবেন: সম্পূর্ণ রূপান্তর ছাড়াই একটা নির্দিষ্ট ধরনের অভিনয় ঘটে যখন কোন নাট্যপরিচালক কিংবা একজন সহযোগী কোন অভিনেতাকে একটা বিশেষ অংশ কীভাবে অভিনয় করতে হয় দেখিয়ে দেন। এই বিশেষ জায়গাটুকু তাঁর নিজের অভিনয়ের অংশ নয়, সুতরাং তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিতকরেন না, তিনি শুধু ব্যবহার-গত দিকটা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেন এবং একজন নিছক উপদেষ্টার দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখেন।

সম্পূর্ণ রূপান্তরের ধারণাকে একবার পরিত্যাগ করতে পারলে অভিনেতা তার অভিনয়ের অংশটুকু একটা উদ্ধৃতির মতো উচ্চারণ করেন, এমনভাবে নয় যেন তিনি নিজেইসেই অংশটুকু পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই বানিয়ে নিচ্ছেন (improvising)। সেইসঙ্গে অবশ্য তিনি উদ্ধৃতিটির স্পষ্ট ব্যঞ্জনাটুকুও ফুটিয়ে তোলেন এবং বক্তব্যটির পূর্ণ মানবিক ও মূর্ত রূপরেখাগুলিকেও পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেন; অনুরূপভাবে, যেসব অঙ্গভঙ্গি তিনি করবেন তার মধ্যেও উপস্থিত থাকবে মানবিক অঙ্গভঙ্গির পূর্ণতা, যদিও তখন এসব অঙ্গভঙ্গি তার কাছে এক ধরনের নকল করা ছাড়া আর কিছু নয়।

অভিনয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপান্তর অনুপস্থিত এটাকে মেনে নিলে, রূপান্তরিত হচ্ছে এমন চরিত্রগুলির কার্যাবলি এবং সংলাপকে এলিয়েনেট (alienate) করতে তিনটি জিনিশ সাহায্য করতে পারে:

১, তৃতীয় পুরুষে স্থানান্তরণ

২, অতীতকালে স্থানান্তরণ

৩, মঞ্চনির্দেশগুলি জোরে-জোরে পড়া।

তৃতীয় পুরুষ এবং অতীতকাল ব্যবহারের ফলে অভিনেতার পক্ষে নিরাসক্তির সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, তার অভিনয়ের অংশ-টুকুর ওপর মন্তব্য করে এমন সব মঞ্চনির্দেশ এবং টিপ্পনিগুলি তিনি খুঁজে নেবেন

এবং মহলার সময় জোরে-জোরে পড়বেন ('সে দাঁড়িয়ে উঠে ঘৃণার তাড়নায় রাগে চীৎকার করে উঠল' অথবা 'তাকে এভাবে আগে কখনো বলা হয়নি, এবং সে বুঝতেই পারল না ব্যাপারটা সত্য কি মিথ্যা' অথবা 'সে হেসে উঠল এবং কৃত্রিম অনীহা নিয়ে বলল...')। মঞ্চনির্দেশগুলি তৃতীয় পুরুষে পড়ার ফলে উচ্চারণের দুটো স্বরগ্রামে একটা সংঘাত সৃষ্টি হয়। যার ফলে দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ নাটকের আসল অংশটুকু, এলিয়েনেটেড হয়। এ-ধরনের অভিনয় আরও বেশি এলিয়েনেটেড হয়, কেননা এটা পূর্বেই শব্দে যারা চিহ্নিত এবং ঘোষিত হবার পর মঞ্চের ওপর অভিনীত হচ্ছে। অতীতে স্থানান্তরণের ফলে বক্তা এমন একটা অবস্থায় আসে যখন সে নিজের পূর্ব-উচ্চারিত শব্দগুলির দিকে ফিরে তাকাতে পারে। এভাবে বাক্যটিও এলিয়েনেটেড হয়, কিন্তু অভিনেতাকে কোন অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হয় না। তিনি নাটকটি সম্পূর্ণভাবে পড়েছেন এবং ফলত কোন একটি বাক্যকে সমাপ্তি ও পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে আরও ভাল করে বিচার করার সুযোগ পান; এটা কিন্তু দর্শকের পক্ষে অসম্ভব, কেননা দর্শক বাক্যটি সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে অজ্ঞ এবং অপরিচিত।

মহলার সময় এই মিশ্র পদ্ধতিটি মূল নাটকের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করে এবং এটা সাধারণ অভিনয়েও বজায় থাকে। দর্শকদের সঙ্গে এই সরাসরি সম্পর্ক বাস্তব সংলাপের স্বরগ্রাম পালটাতেও সাহায্য, এমনকি বাধ্য, করে এবং এই পরিবর্তন বাক্যগুলির কমবেশি অর্থময়তার ওপর নির্ভরশীল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মহামান্য বিচারশালায় সাক্ষীদের সংলাপ ধরা যাক্। তির্যক অর্থ, নিজেদের মন্তব্যের ওপর চরিত্রগুলির জোর দেওয়া, ইত্যাদি সবকিছুই সকল শিল্প-দক্ষতা নিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে। যদি দর্শকদের দিকে অভিনেতা ঘুরে দাঁড়ান, তাহলে তাকে সম্পূর্ণভাবেই ঘুরে দাঁড়াতে হবে, পুরনো নাটকীয় ঢঙে অপাঙ্গ উচ্চারণ কিংবা স্বগতোক্তিতে কাজ হবে না। কাব্যিক মাধ্যম থেকে সম্পূর্ণ এলিয়েনেশন এফেক্ট পেতে হলে অভিনেতাকে মহলা শুরু করাতে হবে কবিতার বক্তব্যকে ইতর গদ্যে পরিবর্তিত করে এবং সম্ভব হলে এর সঙ্গে কাব্যের উপযোগী অঙ্গ-ভঙ্গিকে বজায় রেখে। ভাষাগত মাধ্যমের দুঃসাহসী কিন্তু সুন্দর ব্যবহার মূল রচনাকে এলিয়েনেট করবে (অভিনেতার প্রাদেশিক ভাষায় পরিবর্তিত হলে গদ্যও অনুরূপভাবে এলিয়েনেটেড হয়)।

অভিনেতা যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে সেটা হবে সামাজিকভাবে সমালোচনা-মূলক দৃষ্টিভঙ্গি। ঘটনাবলির উপস্থাপনা এবং চরিত্রসৃষ্টি করতে গিয়ে সমাজের

অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই তাকে তুলে ধরতে হবে। এভাবে অভিনেতার অভিনয় দর্শকের সঙ্গে তার (সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে) এক আলোচনায় পর্যবসিত হয়। দর্শকের শ্রেণী অনুসারে এই অবস্থাগুলিকে সমর্থন বা বিলোপ করতে অভিনেতা তাকে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রত্যেকটি ঘটনার পশ্চাতে নিহিত সামাজিক ভাবকে এলিয়েনেট করাই এলিয়েনেশন এফেক্টের উদ্দেশ্য। সামাজিক ভাব বলতে বোঝায় একটা নির্দিষ্ট কালে মানুষেরমধ্যে বর্তমান সামাজিক সম্বন্ধগুলির মূকাভিনীত এবং অঙ্গভঙ্গিগত প্রকাশ। সমাজের জন্য এ-ধরনের ঘটনা সৃষ্টি করা এবং প্রত্যেকটি দৃশ্যের নামকরণ করে তাকে এমনভাবে গুছিয়ে পরিবেশন করা যাতে সমাজের হাতে চাবিকাঠিটি তুলে দেওয়া সম্ভব—এ-সব খুব কার্যকরী হয়। এ-সব নামকরণের অবশ্যই একটা ঐতিহাসিক গুণ থাকা প্রয়োজন।

একটা পদ্ধতিগত বিষয় এবার খুব প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেবে : ঘটনাগুলোকে ইতিহাসভুক্ত করা। আমাদের পূর্বসূরীদের আচরণ আমাদের থেকে এলিয়েনেটেড হয় এক নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তনের ধারায়। একজন ঐতিহাসিক অতীতের ঘটনাগুলিকে যে নিরাসক্তি দিয়ে দেখেন তেমনি অভিনেতার ওপর নির্ভর করে বর্তমান যুগের ঘটনাবলি এবং জীবনধারার পদ্ধতিগুলিকে ঠিক সেই নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখা। আমাদের থেকে এইসব চরিত্র এবং ঘটনাকে এলিয়েনেট তাকে করতেই হবে।”

আবেগ ও বোধি

দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্য বলেন : যে 'বুদ্ধিকে এতদিন দৈববাণীর মতো অনুসরণ করে এসেছি··· ।' এবং সে বুদ্ধিকে তিনি "প্রেয়সী" সম্বোধন করে বলেন, '···তুমি আমায় অনেক শিখিয়েছ, প্রেয়সী আমার।' এ অসাধারণ বুদ্ধিই চাণক্যের প্রেয়সী। কিন্তু তবু চাণক্য চরিত্রের শূন্যতা এই বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ হয়নি। সজীব বৃক্ষ হয়ে ওঠেনি, হয়েছে 'শুষ্ক কাষ্ঠের গুচ্ছ, প্রাণহীন।' বুদ্ধিসর্বস্ব এই হৃদয়হীন চরিত্র অভিনয় করতে গিয়ে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তাঁর চরিত্র-চিত্রণে 'ক্ষমতা স্নেহের অভাব পূরণ করতে পারে না'—এই উক্তিটিকে পরিস্ফুট করে তুলতেন। বুদ্ধি দিয়ে তিনি যা-কিছু নাট্যঘটনা ঘটিয়েছেন তা আসলে অভিনয়—অর্থাৎ নাটকে সংঘটিত সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপ তাঁর অভিনয়। হৃদয়বান্ চাণক্য বলে, 'একটা সৌন্দর্যের রাজ্য ছেড়ে কোথায় চলেছি।'

এই-যে হৃদয় ও বুদ্ধির বিচার এ কেবল একটি বিশেষ চরিত্রের নয় বোধকরি সমগ্র অভিনয়কার্যের বিচার। এবং এ বিচারও বহুকাল থেকে চলে আসছে নানান্ বিচারকের এজলাসে এবং আজও তা চলছে। একপক্ষে 'আবেগ' অপরপক্ষে বুদ্ধি। এই দুই প্রতিপক্ষ খৃষ্টপূর্ব কাল থেকে নিজের-নিজের স্বপক্ষে কলম ধরেছেন। সিসেরোর (খৃষ্টপূর্ব ১০৬-৪৩) কথা অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে। ক্যুইন্‌টিলিয়ান্ (৩৫-৯৫ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন, 'অপরের মনে আবেগ সঞ্চার করতে হলে, আগে নিজে সেই আবেগ অনুভব করতে হয়।' পরবর্তীকালে প্লুটার্ক (৪৬-১২০ খৃষ্টাব্দ) অবশ্য ভিন্ন সুরের কথা বলেছেন। আবেগানুভূতি শিল্পের প্রকাশে অভিপ্রেত নয় কারণ অনুকরণ রূপেই আনন্দ, সত্য অনুভূতিতে নয়। এবং লুসিয়ান যে উদাহরণটি তাঁর রচনাবলির দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত করেছেন সেখানে [illegible] কঠোর সমালোচনা করেছেন। আত্মশাসন-বিহীন এক অভিনেতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'He was acting the madness of Ajax just after he had been worsted by Odysseus'; and so lost control of himself,' that one might have been ex-

cused for thinking his madness was something more than feigned'।-এর তিনি বিবরণ দিচ্ছেন : সে হঠাৎ যোদ্ধকের পৃষ্ঠদেশ থেকে আচ্ছরণ টেনে ছিঁড়ে ফেলল, একজন সহ-অভিনেতার হাত থেকে বাঁশি কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে অভিসিউসের মাথায় এমন সাংঘাতিকভাবে আঘাত করল—(যে বেচারী পাশে দাঁড়িয়ে তার প্রতিপক্ষের পরাজয়কে উপভোগ করছিল) যে তার শিরস্ত্রাণ যদি ঠিকমতো না থাকত এবং ওই আঘাত সইবার মতো মজবুত না হত তাহলে হতভাগ্য অভিসিউস চরিত্রের অভিনেতার প্রাণান্ত ঘটত। নিঃসন্দেহে এগুলি শিল্পের বিঘ্নস্বরূপ। 'অবাধ প্রবৃত্তির বশে যা-তা করাতে রস-সৃষ্টির এবং রূপসৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মায়'—এ কথা অবনীন্দ্রনাথও বলেছেন। তাই উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা ছাড়া আজকের আলোচনায় এর কোন সার্থকতা নেই। পরবর্তী সময়ে ওই ভূমিকায় আর-একজন অভিনেতা অভিনয় করেছেন। তাঁর সম্পর্কে লুসিয়ান সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিচারশক্তি এবং আবেগ-সামঞ্জস্য অভিনেতাকে প্রকৃত শিল্পীর মর্যাদা দান করেছে।

সূত্রপাত হল একটা তর্কের যে অভিনয়কালীন অভিনেতা আবেগ অনুভব করবে কি করবে না। বহু শতাব্দী পরে অষ্টাদশ শতকে এই আলোচনা একটা নির্দিষ্ট রূপ পেল। ফরাসীদেশে দেনি দিদেরো একটা সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করলেন এই পর্বে। তাঁর বক্তব্যের সারকথা 'প্রতিভা কেবলমাত্র অনুভূতি-সাপেক্ষ নয়, যা সচরাচর ভাবা হয়, বরং তার স্ফুরণ ঘটে:তখনই যখন অনুভূতির বহিলক্ষণ যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে আবার স্টানিস্লাভস্কির তত্ত্বে ভিন্ন সুর, 'must live the part every moment [he is].playing it, and every time।'

দিদেরো (১৭১৩-৮৪) যখন তাঁর দেশের থিয়েটার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠলেন তখন ইংলণ্ডের মতো ফরাসী মঞ্চেও অভিনেতাদের প্রাধান্যের কাল। দিদেরো সত্যিকার বিদগ্ধ মানুষ ছিলেন। নানান্ বিষয়ে তাঁর কৌতূহল। দুশো বছর আগে একজন মানুষ অভিনয়ে একটা আধুনিক ভাবনার অবতারণা করলেন। বুদ্ধিকে স্বীকার করলেন অভিনয়ে অনুভূতি প্রবণতার ঊর্ধ্বে। যদিও তাঁকে সিদ্ধান্তে আসতে অনেক বিপরীত মতের সিঁড়ি ভেঙে আসতে হয়েছিল। অভিনয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি প্রতিভাবান্ অভিনেতাকে 'কবি'র চাইতে বড় শিল্পী হিসেবে আখ্যা দিতে দ্বিধা করেননি। 'একজন মানুষের মধ্যে প্রকৃতি অকৃপণভাবে বহুগুণ সমন্বিত করেছেন।' এ কথা তাঁরই।

অভিনয়কে জীবনপ্রকাশ করতে হবে এবং দর্শকনিরপেক্ষ হতে হবে এই কথা অর্থাৎ ইওরোপে যে অভিনয়রীতি চালু ছিল তাই তিনি অনুসরণ করতে উপদেশ দিলেন তাঁর প্রাথমিক বিচারে (১৭৫৭-৫৮); এবং সেই পর্বে স্বভাববাদী হিসেবে আবেগের স্বাভাবিকত্ব সম্পর্কেও উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। অনুভূতি-প্রবণতাকে তিনি এই পর্বে অভিনেতার পক্ষে আবশ্যিক গুণ বলে স্বীকার করেছেন এবং বিচার ও বুদ্ধির ওপরে স্থান দিতে বলেছেন। দিদেরো তখন বলেছেন, '...an actress of limited judgment, of ordinary understanding but of great sensibility, understands without difficulty a situation of soul, and finds, without thinking, the accent which leads to the different sentiments that constitute the situation, which all the sagacity of the philosophers is unable to unravel.'

দশ বছর পরেই দিদেরো অনুভূতিপ্রবণতাকে আর ততখানি প্রাধান্য দিতে নারাজ হলেন। এই পর্বে একজন অভিনেত্রীকে তিনি লিখেছেন, 'যে সব অভিনেতারা কেবলমাত্র যুক্তি এবং বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে তারা বন্ধ্যা; এবং যারা শুধুই উত্তেজনা ও আবেগপ্লুত হয়ে অভিনয় করে তারা নির্বোধ।' তখন তাঁর মতামত একটা নির্দিষ্ট রূপ পাচ্ছে। 'বিচারশক্তি এবং আবেগের উত্তাপ—এ দুটোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনা কর্তব্য' এই বোধে তিনি উপনীত। এবং এই প্রথম অভিনয়ের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য সম্পর্কে একটা সচেতনতা এল তাঁর তত্ত্বে। এই সামঞ্জস্যের অভাবে একজন ব্যক্তির চরিত্রে যে আন্তর নিগ্রহ (যেমন চাণক্যে) ঘটে এ যেন অভিনয়তত্ত্বে তারই স্বরূপ ব্যাখ্যা। দিদেরোর এই মত পরিবর্তনের কারণ কী সেটা বলা মুশকিল। সম্ভবত প্রচলিত অভিনয়ে আবেগবাহুল্য তাঁকে ক্লান্ত করে থাকবে কিংবা ইংলণ্ডের প্রখ্যাত অভিনেতা গ্যারিকের অভিনয়ে কলাকৌশলের প্রভাব এবং স্বভাববাদী প্রকাশ তাঁকে উৎসাহিত করে থাকবে। তাছাড়া ইতালি থেকে আগত দুই যুগের দুই অভিনেতা পিতা-পুত্র রিকোবোনীর অভিনয় এবং আবেগ সম্পর্কে নানান্ বিক্ষিপ্ত মতামত ও আলোচনা এ মত-পরিবর্তনের কারণ হতে পারে। অষ্টাদশ শতকের এই পর্বে ইওরোপের অন্তত তিনটি দেশে ইংলণ্ড ফ্রান্স এবং জর্মানিতে অভিনয়তত্ত্ব নিয়ে প্রচুর লেখা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতাও তাঁর চিন্তাকে সমৃদ্ধ করে থাকবে। এবং সেই চিন্তা তাঁকে স্বভাব এবং সৃজন এ-দুয়ের পার্থক্য

উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল। বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করা এবং অনুভূতি দিয়ে অনুকরণ করা এ-দুয়ের মধ্যে প্রথমটিকে শ্রেয় বলে স্বীকার করেছেন।

এই শক্তির সিদ্ধান্তে এসেছেন শিল্পসৃষ্টির সার্বিক পথ-পরিক্রমার সুনির্দিষ্ট মতামতের ভিত্তিতে। একটা ছবি, একটা কবিতা, একটি নাটক কিংবা সেই নাটকের মঞ্চে অভিনয় '- does not always spring from the phenomena [অর্থাৎ বস্তুর বা ঘটনার বাইরের চেহারা] but from the emotion felt by the genius who has experienced them, from the art with which he communicates to me the vibration of his soul.' এবং সেই বোধ এবং অনুভব সে দর্শকের পাঠকের মনে জাগাতে পারবে। এর থেকে তিনি সৃষ্টিকার্যের ত্রি স্তর সূত্রের উল্লেখ করেছেন: 'এই পদ্ধতির প্রথম স্তর বাইরের একটা ঘটনা বা বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে তার অর্থ বুঝে উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত হওয়া (উদ্দীপনা) : দ্বিতীয় সূত্র—কল্পনা। এই কল্পনা অনুপ্রাণিত মনে উজ্জীবিত হয়ে অনেকগুলি প্রতিমা তৈরি করে ওই অর্থকে প্রকাশ করে; এই পদ্ধতির এই পর্বই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এর থেকেই শিল্পী প্রেরণা পায় সৃষ্টির। কল্পনা দ্বারা শিল্পী যেমন অনুকৃত রূপকে পায় তেমনি তাকে বিন্যাস করে, সংযোগ করে, পারম্পর্য আনে, কখনও অতিকৃত কখনও জীবনের চেয়ে বড় করে, কখনও তা কাটছাঁট করে। তৃতীয় এবং সর্বশেষ স্তর হল যুক্তি; যে সৃষ্টি করছে তার কলাকৌশলের হাতিয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করে কল্পনায় যে প্রতিমা গড়া হয়েছে তাতে একটা শৃঙ্খলা আনে এবং সম্বদ্ধ অবয়বের স্পষ্ট ধারণা এনে দেয়। প্রতিভাবান্ যদি শিল্পী হন তাহলে এই বোধটাই তাঁর শিল্পকর্ম।'

তাই দিদেরোর তত্ত্বে অনুভূতি-প্রবণতা শিল্পীর পক্ষে প্রয়োজনীয় হলেও কেবলমাত্র তার দ্বারাই শিল্পী হওয়া যায় না। অনুভূত আবেগকে প্রকাশ করাই একমাত্র কাজ নয় শিল্পীর—তার চেয়ে বেশি কিছু তাকে প্রকাশ করতে হয়। আমরা তো সমাজে প্রচণ্ড অনুভূতিশীল আবেগপ্রবণ মানুষকে দেখতে পাই—কিন্তু তাঁরা কি সকলেই শিল্পী?

দিদেরো এ সব তত্ত্ব দীর্ঘদিন ধরে কখনও চিঠিপত্রে কখনও প্রবন্ধে কখনও কোন অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখে গেছেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর বই *Paradox* প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পর প্রকাশিত যে সম্পূর্ণ বইটি বাজারে আসে তাতে অনেকেই সন্দেহ করেছেন যে অনেক আলোচনা দিদেরোর নিজের নয়। আবেগ এবং অনুভূতিকে একেবারেই নস্যাৎ করে তিনি অনেক

ক্ষেত্রেই একটা অস্বাভাবিক উগ্র মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, '...in complete absence of sensibility is the possibility of a sublime actor.' খুবই দুর্ভাগ্যজনক উক্তি। তবু তাঁর তত্ত্বকে বুঝতে এই *Paradox*-এর তিনটি মত উল্লেখযোগ্য। এক, যে অভিনেতা কেবলমাত্র স্বভাবকে অনুসরণ করে সে অপাঙ্‌ক্তেয়, হয়তো কখন-কখন তাকে খুব ভাল লাগে,' অর্থাৎ এরা মাঝারি ধরনের সাধারণ অভিনেতা। 'বিচারবোধ এবং একটা নিরাসক্ত দ্রষ্টার সত্তা এদের ভেতর থাকা উচিত।' দুই, অভিনেতার 'শক্তি তার অনুভব ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না—সচরাচর তাই ভাবা হয়: কেমন করে সে অভিনয়টি করছে তার ওপরেই নির্ভর করে—প্রমাণিত হয় বহিঃপ্রকাশের লক্ষণ দেখে...।' তিন, প্রকৃতি বা স্বভাবের সূক্ষ্ম প্রকাশ সেই করতে পারে যে 'আবেগ এবং প্রতিভা দিয়ে তা অনুভব করতে পারে এবং নিজের সমস্ত চৈতন্যকে জাগ্রত রেখে তা প্রকাশ করতে পারে।' অর্থাৎ নিজেকে বিস্মৃত না হয়ে—নিজের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রেখে। হৃদয়-তাড়িত অভিনয় নয়, অভিনয় হল গভীরে প্রবেশ করে বা মর্ম উদ্‌ঘাটন করে তাকে অভিব্যক্তি দান, যে অভিব্যক্তি অভিনেতার ক্রিয়াকৌশলের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে দর্শকসমক্ষে। একটি সুন্দর উদাহরণ এই সূত্রে তিনি দিয়েছেন এবং তাঁর উক্তির যাথার্থ্য নির্ণয় করেছেন: 'প্রিয়জনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে একজন কবি যখন শোকের আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ে তখন কি সে কোন শোকগাথা বা মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করতে পারে? পারে না। বেদনার ঝড়টা যখন কেটে যায়, অভিভূত ভাবটা যখন কেটে যায়, আবেগ উত্তেজনা যখন স্তিমিত হয়ে যায়, ঘটনাটা দূরবর্তী হয়, হৃদয় যখন শান্ত তখনই স্মৃতিপটে জীবনের ক্ষতির হিসেবটা স্পষ্ট হয়, তার সুখ যে বিগত, রাহুগ্রস্ত,—এটা উপলব্ধিতে আসে, স্মৃতি এবং কল্পনা তখন মিলিত হয়, তখন সে নিজেকে ফিরে পায়, সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, তখন খুঁজে পায় অভিব্যক্তি। অতীতের সুখস্মৃতি তীব্র হয়, তখনই, হ্যাঁ, কেবল তখনই একজনের পক্ষে সম্ভব আত্মস্থ হয়ে সেই দুঃখের শিল্পরূপ প্রকাশ। চোখের জলের কাব্য সে লিখতে পারে, কিন্তু কাব্য-রচনাকালে বা রচনার পরিমার্জনা করার সময় সে-অশ্রুজল নিশ্চয়ই ঝড়ে পড়বে না। তা যদি ঘটে তা হলে তার লেখনী স্তব্ধ হয়ে যাবে।' উদাহরণটি দিয়ে দিদেরো প্রশ্ন তুলেছেন: অভিনেতার ক্ষেত্রে ভিন্ন পন্থা হবে কেন। তিনি বলেছেন, 'cool reflection must bring the fury of enthusiasm to its bearings.' সেইজন্যেই তাঁর তত্ত্বের মূল কথাটা উত্তাল হৃদয়ের ওপর মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ।

একজন বড় অভিনেতা বাইরের রূপটাকে প্রত্যক্ষ করে, তার 'মডেল' হল একজন অনুভূতি আবেগ সম্পন্ন মানুষ; সে তাকে নিয়ে ভাবে, গ্রহণ-বর্জনের খেলা চলে তার মধ্যে তখন' — অর্থাৎ অভিনেতা খুঁটিয়ে দেখবে বাস্তবের চেহারাটা তারপর নাটকের অনুষঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহারকে, আবেগকে পরিবর্তন পরিবর্জন, পরিবর্ধন করবে শিল্পীর আপন প্রজ্ঞা ও রুচি অনুযায়ী। সে কেবল-মাত্র তার মডেলকে বা তার আবেগকে অনুকরণ করে তারপ্রতিমা রচনা করবে না। তাকে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করতে হবে বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যকে যা সে আবিষ্কার করেছে তাকে গড়ে তুলতে তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে।

বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত অভিনেতারা মঞ্চে তাদের সমস্ত কার্যকলাপ বিচার করতে পারে। তারা নিজেদের দেখতে পায়, নিজেদের কথা শুনতে পায়, এবং তার ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াটাও বুঝতে পারে। তাই মঞ্চে তার দুটো ব্যক্তিত্ব কাজ করে — যাকে দ্বৈত সত্তা বলা হয়েছে। একজন অভিনেতা নিজে, অপরজন যে চরিত্র সে অভিনয় করছে। সে তখন সবসময় অভিনেয় চরিত্রকে নির্দেশ দিচ্ছে বা চালিত করছে, তাকে তার ইচ্ছাধীন থাকতে বাধ্য করছে, যে বার্তাদর্শকের কাছে পৌঁছে দেবার তা পাঠাতে তৎপর করে দিচ্ছে।

প্রতিপক্ষের যুক্তিকে তিনি খণ্ডন করেছেন এই বলে যে একজন আবেগাপ্লুত অভিনেতা তার মঞ্চক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া কখনই লক্ষ করতেপারে না। এইজাতীয় অভিনেতাদের নিজের মনের ওপর কোন কর্তৃত্ব থাকে না। তার অনুভব শক্তি প্রবল হতে পারে কিন্তু সে সেটা যথার্থভাবে প্রকাশ না-ও করতে পারে এবং সব-চেয়ে দুর্ভাগ্য সে বেচারা বুঝতেও পারে না যে সে প্রকাশে অক্ষম। দিদেরো বলেছেন, যদি ধরে নেওয়া যায় যে একজন ভাল অভিনেতা বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত না হয়ে কেবলমাত্র আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে অভিনয় করে তবে সে হয়তো আমাদের নেশা ধরাবে, হয়তো সে একটি কি দুটি কিংবা তিনটি সুন্দর মুহূর্ত রচনা করতে পারবে, কিন্তু সেটাই কি সব। সুন্দর এক-আধটা মুহূর্ত অথবা সর্বাঙ্গ-সুন্দর একটি ভূমিকা — কোনটা শ্রেয়। ক্ষণিক উদ্ভাসন নয়, সমগ্র অনুভূতির অটুট আসন; একটা চরিত্রের আলো-আঁধারি, তার শক্তি এবং তার দুর্বলতা, শান্ত এবং ভয়ঙ্কর মুহূর্তের মধ্যে সমতা রাখা, সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং দর্শকের ওপর প্রভাব বিস্তার করা এ সবই ঠাণ্ডা মাথার কাজ, গভীর বিচারবোধের কাজ, রুচির প্রয়োজন — প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রমের আর প্রচুর অভিজ্ঞতার। সমস্ত পরি-

কল্পনাটা মাথায় না থাকলে সে অভিনয় অর্বাচীন হয়ে থাকবে চিরকাল। দিদেরো হৃদয়ানুভূতিকে বাদ দিতে বলেননি, বলেছেন 'আবেগের ওপর বুদ্ধির পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে।

দিদেরোর এই অভিনয়তত্ত্বে অনেক সময়েই স্ব-বিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। তবু তার মধ্যে মূল তত্ত্বটি খুঁজে নিতে অসুবিধে হয় না। সমসাময়িক নানান্ ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তাঁর মত অনেক সময়েই বেশ উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পুরনো পুরুষ-শাসিত সমাজে হৃদয়কে স্ত্রীদের মতো ভেবে এবং বুদ্ধিকে স্বামীর মর্যাদা দিয়ে .য কর্তৃত্বের কথা তিনি বলেছেন সেটা বোধহয় এ দুয়ের সুস্থ পরিণয়ের কথাটাই মনে করিয়ে দেয় আজকে। এ কথা কে অস্বীকার করবে যে সমস্ত শিল্পের মতো অভিনয়েও অনুভূতি রয়েছে মূলে,—পাতায় ফুলে যে গাছটা শোভিত হচ্ছে তা রস আহরণ করছে সেই মূল থেকে—তবুও তাদের গঠন আকৃতি পাচ্ছে বুদ্ধির দৌলতে। অবনীন্দ্রনাথের কথায় 'শিল্পের মূলে রয়েছে নিছক প্রবৃত্তি নয়, বুদ্ধির দ্বারা এবং রসবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি।' —এই কথাটাই বোংকারি এ আলোচনার সার কথা।

নাট্যনির্দেশনার বিবর্তন

আকাশের তারার কান্নার জলে নাকি সমুদ্রের অতলে মুক্তার জন্ম হয়েছিল। আধুনিক নাট্য-পরিচালকের জন্মও কি থিয়েটারের কান্নার জলে? শনি বা রাহুর দশা কাটিয়ে থিয়েটারকে বাঁচাবার জন্যেই কি পরিচালকের আবির্ভাব? কিন্তু কবে?

যাঁরা এই নাট্য-ব্যাপারের ব্যাপারী, তাঁরা ইতিহাসে লিখেছেন যে একটা সজীব শিল্প বিবর্তনের নিয়ম মেনে ক্রমশ এগুতে-এগুতে মুখ থুবড়ে পড়ে আটকে গেল একটা যুগে এসে। তখন সেই বিশৃঙ্খল অবস্থায় বাঁধাধরা মঞ্চব্যবস্থাকে একটা গতিশীল নাট্যরীতিতে প্রকাশের তাগিদেই সম্ভব হল পরিচালক নাম-ধারী ব্যক্তিটির আবির্ভাব। এটা একশ বছরের কিছু কম সময়ের ইতিহাস। তখন পরিচালক, 'রেজিসিয়ার' এ নামকরণও হয়নি। কয়েকজন বিক্ষুব্ধ, বীতশ্রদ্ধ সমালোচকের মনে শুধু একটা আদর্শের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে তারা। শব্দগুলির আধুনিক অর্থবোধ সবে শুরু হয়েছে তখন, বরঞ্চ লোকে নিয়ম-শৃঙ্খল-রক্ষক হিসেবেই একজনকে জানত দেখত। ইতিমধ্যে মঞ্চাধ্যক্ষ শব্দটার-সঙ্গে পরিচয় অবশ্য ঘটেছিল। এরাই নিঃসন্দেহে আধুনিক অর্থে পরিচালকদের ছায়ারূপ যার বর্তমান রূপ একটা চূড়ান্ত নাট্যরীতির সন্ধানে এগিয়ে চলেছে, যেখানে একটিমাত্র লোকের সুচারু পরিকল্পনায় নাটক, মঞ্চ, অভিনেতা, তার চলাফেরা, সজ্জা সব-কিছু একত্র গ্রথিত হয়ে একটা সুগম, জৈব, নাট্যরূপ পাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিকালে নাট্য-পরিচালকের আবির্ভাব প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে এত অনিবার্য ছিল যে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে যুগ-যুগ ধরে নাট্যকার এবং অভিনেতার যে প্রাধান্য ছিল তা সে হরণ করে নিল। মঞ্চের পিছন থেকে অদৃশ্য হাতের স্পর্শে ব্যক্তিত্বের ছাপ এঁকে দিতে পারল। তার নিয়ন্ত্রণে একটা আধুনিক নাট্য-মান নির্ণীত হল—যেমন একদা এলিজাবেথীয় যুগে নাট্যকারের লেখা শব্দগুলোই থিয়েটারের জীবনকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল, যেমন নটের ব্যক্তিগত চুম্বকী আকর্ষণ অষ্টাদশ শতকে দর্শক-সাধারণকে বিমুগ্ধ করেছিল। পরিচালকের জন্মের

সঙ্গে সম্ভব হল একটা নতুন এবং মৌলিক থিয়েটারি যুগের, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা তার সাফল্য-ব্যর্থতা সব-কিছুই মঞ্চকে বাঁচিয়ে রাখল।

আধুনিক নাট্যজগতের যাঁরা গ্রহপতি সেই আঁতোয়া, স্তানিস্লাভস্কি, আপ্পিয়া, ক্রেগ, রাইনহার্ট, মায়ারহোল্ড, কোপো—এঁরা থিয়েটারের মধ্যে একটা অভাব আবিষ্কার করলেন। তাঁরা দেখলেন যে নাট্য-প্রযোজনা, এবং দর্শকের মনে তার প্রভাব—এই দুইয়ের মধ্যে একটা হোমোজিনিয়াস্ মূল্যায়নের অভাব রয়ে গেছে। তাঁরা জোর দিলেন যে যদি থিয়েটারকে তার পুরোন সামাজিক মর্যাদা ফিরে পেতে হয় তবে পরিচালককে তাঁর বোধ দিয়ে নাটক, নাটকের অভিনয়, এবং অভিনয়ের দর্শককে একটি সাধারণ সূত্রে গাঁথতে হবে। সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে নিজনতায়, পাঠকের সঙ্গে যোগসূত্র তার বিচ্ছিন্ন। কিন্তু নাটকে দর্শকের সঙ্গে যোগসূত্র প্রত্যক্ষ—এমনকি ব্যক্তিগত। পরিচালকের দায়িত্ব সেই ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করা। আমাদের সমাজ-জীবনে ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে যে ভিন্নমুখিতা তার মধ্যে থেকেই পরিচালক তাঁর ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্যঞ্জনাময় শিল্প এবং দর্শক-সমাজকে যুক্ত করবেন। যৌথ শিল্প হিসেবে থিয়েটারকে দেখতে গেলে তার মূল দাবী হল শিল্পজাত এবং সমাজগত ঐক বোধ প্রতিষ্ঠা। এই দাবী পূরণ করতেই পরিচালকের উদ্ভব।

দায়িত্বের কথা উঠতেই লুই জুভের কথা মনে পড়ছে। পরিচালকের দায়িত্বের এক লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে তিনি বললেন: "The director or metteur-en-scene, has been called the gardener of spirits, the doctor of sentiments, the midwife of the inarticulate, the cobler of situations, cook of speeches, steward of souls, king of the theatre and servant of the stage, juggler and magician, assayer and touchstone of the public, diplomat, economist, nurse, orchestra leader, interpreter, painter and costumer—a hundred definitions." বলেই মন্তব্য করলেন: "...but all of them are useless. The director is indefinable because his functions are undefined."—এ যে দেখছি গুণাতীত নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ! বাস্তবিকপক্ষে সমসাময়িক থিয়েটারে নির্দেশনার ক্রাফটা এমন প্রাধান্য পেয়েছে, এত বিস্ময় ও আগ্রহের সৃষ্টি করেছে, এত বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কর্মপ্রচেষ্টা এবং বাঁচবার জন্যে এত মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে, এবং একাধিক গোড়ার সমস্যার ঝুঁটি ধরে

টান দিতে সে সাহায্য করেছে যে "·· it has often — and wrongly — been considered an art in itself." — বলেছেন কোপো আধুনিক ভাবগতিক দেখে। তিনি আরও বললেন, "কেউ-কেউ জোরের সঙ্গে বলছে যে পরিচালক একটা সার্বিক প্রতিভার অধিকারী; অভিনেতা থেকে শুরু করে সৃষ্টিশীল লেখক, এবং তাঁর মধ্যেই চিত্রকর, সুরকার, — এই ব্যাপক পরিধির মধ্যে তাঁর অনায়াস বিচরণ। বস্তুত, পরিচালকের এই রূপ একটা আদর্শ মাত্র।" — ব্রহ্মস্বরূপের কল্পনার মতোই। যাই হোক্, এ-কথা স্বীকার্য যে পরিচালক ব্রহ্মা না-হন, চতুর্মুখ ব্রহ্মার চারটে মাথার 'গ্রে-ম্যাটার' ধারণ করেন নিশ্চয়ই। কথাটার সমর্থন মিলবে নেমিরোভিচ্ দান্‌শেঙ্কোর কথায়। পরিচালক সম্পর্কে তিনি বললেন, "· a triple-faced character." তিনটে মাথার কাজের হিশেবও যথানির্দিষ্ট করলেন তিনি।

এই কৃতকর্ম ব্রহ্মার জন্মলগ্ন খুঁজছিলাম। এত যাঁর গুণ তাঁর বৃহস্পতির কী তুঙ্গে অধিষ্ঠান! পুরোন পঞ্জিকা থাকলে ১লা মে ১৮৭৪ সালের গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করা যেত। ঐ দিনটিকে নাট্য-ইতিহাস প্রণেতারা পরিচালকের ইতিহাসে লাল কালিতে লেখা দিন বলে গণ্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্যই এর প্রারম্ভিক পর্ব শুরু হয়েছে অনেক আগেই। নাট্যকারদের প্রাধান্যের আমল থেকেই। নাট্যবোধ এবং নাট্যানুষ্ঠান তো প্রাচীন গ্রীস থেকে এলিজাবেথীয় ইংলণ্ড এবং চতুর্দশ লুই এর ফ্রান্স সর্বত্রই ছড়িয়েছিল। ঈস্কিলাস থেকে শেক্স-পীয়ার মলিয়ের। ঈস্কিলাসকে পুরোন সমালোচকরা এ ব্যাপারে পথিকৃৎ বলেছেন 'the brilliant mounting of his plays' এর জন্য।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের বিবরণীতে আমরা মাস্টারমশায় এবং মঞ্চাধ্যক্ষের সাক্ষাৎ পাই। একটা মজার ছবি আছে — উডকাট্ — প্যাশন প্লে-র মহলার ছবি। একগাদা অভিনেতার মাঝে অধ্যক্ষমশাই আছেন লম্বা জোব্বা জামা পরে, এক-হাতে তাঁর প্রম্পট্-এর বই, অন্য হাতে বাগানো এক মস্ত ছড়ি। অভিনয় শিক্ষা দিচ্ছেন তিনি। আজকের দিনের অভিনয়-শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন তুলবেন বোধ করি। তবে ভরসার কথা তার প্রয়োজন হবে না, সংস্কৃতির পথে নাট্যশিক্ষার ধারা গেছে পাল্টে। বার্নার্ড শ-এর কথায় এঁরা ভরসা পাবেন। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে চিঠিতে জানিয়েছেন, 'খবরদার স্কুলমাস্টারি ক'রো না অভিনয় শেখানোর সময়। অযথা রাগারাগি ক'রো না। কিছু না-পারলে সেদিনকার মতো ছুটি দেবে — তাতে ফল ভাল হবে। নইলে তোমার চটাচটিতে

পুরো পরিবেশটাই নষ্ট হবে, যে-পরিবেশে কোন শিল্পের জন্ম হয় না। এমন দৃশ্যের অবতারণা ক'রো না যে দৃশ্য নাটকের মধ্যে নেই।' পরিচালকের রিহার্সাল দেওয়ার প্রসঙ্গেই তিনি এ-কথাগুলো জানিয়েছিলেন।

এলিজাবেথীয় আমলেই প্রথম আধুনিক পরিচালকেরা তাঁদের যথার্থ পূর্বসূরীর দেখা পান। অনেক হালের কথা, অনেক চেনা স্বর এখানে। শেক্সপীয়ারের বলার কথা হ্যামলেটের কণ্ঠস্বরে শুনতে পাবেন আজকের নির্দেশকরা সেই দৃশ্যে, যেখানে প্রিন্স উপদেশ দিচ্ছেন তাঁর অভিনেতাদের অভিনয়ের আগে। আজকের দিনে নিজেদের মঞ্চের সীমাবদ্ধ চৌহদ্দির কথা ভেবে যাঁরা অতৃপ্ত তাঁরা শেক্সপীয়ারের 'unworthy scaffold'-এর অভিযোগের সহমরমী হবেন। শিল্পী-'দের অভিনয়রীতি শিক্ষা দিতে মলিয়েরও নাকি অতি দক্ষ পুরুষ ছিলেন। চরিত্র বিশ্লেষণ, অভিনয়ে সূক্ষ্ম ভাব, প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে ব্যঞ্জনা আনার চেষ্টা করলেন মলিয়ের—যা প্যারীর মঞ্চে অজানা ছিল।

এ সত্ত্বেও পরিচালকের আধুনিক আদর্শের সঙ্গে এঁদের তফাৎ ছিল প্রচুর। শিল্পী হিসেবে পরিচালকের যে দৃষ্টিকোণ থাকা দ.কাব—লাঁ স্ট্রাসবার্গের ভাষায়, যেখান থেকে অভিনেতার এবং নাট্যঘটনার সমস্ত খুঁটিনাটির পিছনে যুক্তি আছে বলে মনে হবে—মনে হবে সেগুলি গভীর অর্থবহ—সত্য এবং প্রাণোদ্দীপক। স্বীকার করতেই হবে এঁদের থিয়েটারে তা ছিল না। তার কারণ অনেক। একটা কারণ বোধ হয় এই যে এঁদের কাছে নাটক মঞ্চস্থ করাটা আলাদা কোন নান্দনিক সমস্যা হিসেবে আসেনি। এসেছিল, তাঁদের সাহিত্য-কীর্তির সহযাত্রী হিসেবে। নতুন সৃষ্টি নয় একই সৃষ্টির অন্তর্ভূত হয়ে একটু ভিন্নতর স্বাদ। যদিও এদের অনেক লেখাই নাট্যশালার প্রয়োজনে, তবুও—।

এর পরই ইতিহাসের পট-পরিবর্তন। ইউরোপে রেনেসাঁসের যুগ; শিল্পে, স্থাপত্যে, চিত্রকলায় এ-যুগ নতুন প্রাণের বন্যা আনল। স্বাভাবিকভাবেই মঞ্চেও এর ঢেউ লাগাল, সেইসঙ্গে কিন্তু মানুষের জীবনধারার যে চিরন্তন রীতি ছিল সেটার মূল্যও গেল পালটে; সমাজ-ব্যবস্থায় বিকল্পন শুরু হয়েছে তখন, দর্শকের আবেগের ঐক্য নষ্ট হচ্ছে,—সঙ্গে-সঙ্গে থিয়েটারও তার ভেতরের সংকলিত রূপ হারাতে বসল। অথচ শিল্পে চিত্রে ভাস্কর্যে স্থাপত্যে কারু-কৌশলে যে নতুন রীতির আমদানি হল তার প্রয়োগে অভিনয়শিল্পের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল—সেইসঙ্গে এই গিঁড়ে-আলগা থিয়েটারে—ভেতরের ঐক্য অসম্ভব হলে, বিকল্প ব্যবস্থায় বাইরের ঐক্যের চেষ্টাও চলতে লাগল।

অভিনেতা-প্রধান এবং নাট্যকার-প্রধান থিয়েটারগুলোর এ কাজ করার ক্ষমতা তখন ছিল না। কিন্তু যা অনিবার্য তা ঘটবেই। তাই প্রয়োগশিল্পের একটা বিশিষ্ট ধারা গড়ে উঠল—পুরো ব্যাপারটায় একটা 'সু-ছাদ' আনার চেষ্টায়। এবং এই বিশিষ্ট ধারার পরীক্ষার মধ্যেই নাট্যপরিচালকের আদি সংস্করণের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। থিয়েটারের মধ্যে একটা ঐক্যবদ্ধ ছন্দ আনার অন্বেষার শেষ নেই। অভিনেতা-ম্যানেজার গ্যারিক থেকে শুরু করে প্রিন্স-অব-ম্যানেজার্স চার্লস কীন্ এবং ফিলিপ কেম্বল থেকে অধ্যক্ষ চার্লস ম্যাকার্ডে পর্যন্ত এই সংকলনের চেষ্টা করে এসেছেন। এইসময়ে উন্নতিও ঘটেছে প্রচুর। কিন্তু একত্র-গ্রন্থনের যে আদর্শ লক্ষ্য ছিল সেখানে তাঁরা পৌঁছতে পারেননি। নিঃসন্দেহে তাঁদের প্রচেষ্টা পথ তৈরি করেছে। এঁদের আরব্ধ কাজ পূর্ণ হল জর্মান দেশীয় এক শিল্পী রাজপুরুষের হাতে, ডিউক্-অব-সেক্সেমেনিন্‌জেন। তিনি ঐ ১লা মে ১৮৭৪ সালে তাঁর অখ্যাত সম্প্রদায়কে নিয়ে বার্লিন শহরে এলেন এবং সেখানে অভিনয়-আসরে ডাইরেক্টার্স থিয়েটার বা পরিচালকের থিয়েটারের এক প্রথম নিদর্শন রাখলেন। (এইখানে স্মরণ করা যাক যে আমাদের এই বাংলাদেশে এর মাত্র দু-বছর আগে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয়ের ভিত গাঁথা হয়েছে।)

অগ্রবর্তী দলের লোকেরা যে কাজগুলি এতদিন বিচ্ছিন্নভাবে করার ফলে যথার্থ 'পরিচালক' আখ্যা পাননি—সেগুলি ডিউকের হাতে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করল। প্রচণ্ড রিহার্সাল, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে অভিনয়, ইতিহাসের সঙ্গে সংগতি রেখে মঞ্চসজ্জা, পোশাক-নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে একটা বাস্তবিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করে তিনি ইতিহাস তৈরি করলেন। ডিউকের রাজকীয় ক্ষমতার ফলে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে এগুলো সম্ভব হল সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি তার পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে গেলেন নানান্ দিক থেকে। আঁকা পট এবং মঞ্চে অভিনয়রত শিল্পী এ-দুইয়ের মধ্যে প্রথম তিনি একটা হারমনি আনার চেষ্টা করলেন। এবং অভিনেতার প্রতিটি অঙ্গক্ষেপ পূর্ব-নির্দিষ্ট করা হল। ডিউকের এই অভিনব নাট্যপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য অভিনেতাকে অভিনয়ের উপকরণ হিশেবে তাঁর ব্যবহারে—ব্যক্তিগত স্বাভাবিক অভিনয়-প্রতিভাকে অতোধিক প্রশ্রয় না দিয়ে। কোন খুঁটিনাটিকে তিনি বাদ দিতে প্রস্তুত নন। তার যথাযথ রূপায়ণেই তিনি সচেষ্ট। প্রতিবিম্বন-শিল্প মাত্রই অবশ্য তখন এদিকে ঝুঁকেছিল। মেনিন্‌জেনের ডিউকের সাজ-সজ্জা

প্রয়োগশিল্প একটা চূড়ান্ত রূপ পেল। সমগ্র অভিনয়কে সুসম্পাদিত ঐক্যরূপ দেওয়ার জন্তই একজন সর্বাধিনায়ক পরিচালকের প্রয়োজন ছিল। এই অভি-ব্যাপ্ত ঐক্যরূপই নাটকের প্রাণ—"soul of the play" যা এতদিন নাট্যকারের লেখার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। নাট্যকারের উপস্থিতি অনেকাংশে গৌণ হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এই প্রাধান্ত কমানর চেষ্টাটা যখন পরবর্তীকালে উৎকট হয়ে দেখা গেল তখনই তা মারাত্মক হয়ে উঠল। হেনরি আরভিং-এর মতো জবরদস্ত প্রযোজক-অভিনেতার মতে নাট্যকারের চেয়ে থিয়েটার বড। এর লক্ষ্য নাট্য কারের বক্তব্যবিষয়ের অনেক উর্ধ্বে। আসলে নাটক লেখা হয় থিয়েটারের জন্তে—থিয়েটার নাটকের জন্ত নয়। তাঁর নাট্যপরিচালনাও এই সূত্র ধরেই এগিয়েছিল।—বলা বাহুল্য, সব বাড়াবাড়ির মতো এ-মতবাদও সুস্থ নয়। নাট্য-কারের কল্পনাশক্তিকে বাদ দিলে থিয়েটার সামাজিক অনুষ্ঠান না হয়ে একটা শো—একটা দৃশ্যবস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। আঁতোয়ার কাছে এ-ব্যাপারে নাট্যকাররা ঋণী। পরিচালক হিশেবে তিনি নাট্যপ্রযোজনাকে একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার বলে গ্রহণ করেননি। নতুন সাহিত্যের সন্ধান এবং নতুন নাট্যকারদের অধিকার রক্ষাও কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। লেখকদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। স্টেজ ট্রিক্স্-এর প্রচলিত মোহ ছেড়ে এক শ্রেণীর দর্শক তিনি হারালেন সত্য—কিন্তু আদর্শ হারালেন না।

ইতিমধ্যে শিল্প-লক্ষণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ডিউকের আমলে রিয়ালিজম্ থেকে এমিল্ জোলার ন্যাচারালিজম্-এর ঢেউ এসে লাগল মঞ্চেও। আঁতোয়া নাট্যপ্রযোজনায় এই ন্যাচারালিজম্-এ বিশ্বাসী। উপযুক্ত পারিবেশ সৃষ্টি করতে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা। তাঁর বক্তব্য, পরিবেশই চরিত্রের কার্যকলাপ নির্ধারণ করবে—কার্যকলাপ দেখে পরিবেশ নির্ধারিত হবে না। ডারউইনের 'পরিবেশ-বাদ' তখন একটা বৈজ্ঞানিক সত্য।

এরপর আসরে এলেন স্তানিস্লাভস্কি ও নেমিরোভিচ দানশেঙ্কো রুশ নাট-মঞ্চে। বোধহয় ন্যাচারালিজম্পন্থী পরিচালকদের মধ্যে স্তানিস্লাভস্কির আসন সবার উপরে। আঁতোয়া প্রমুখদের সঙ্গে তাঁর তফাৎটা এই যে নতুন নাট্যবস্তু অপেক্ষা তাঁর আগ্রহ নতুন নাট্যরীতিতে। ৩৫ বছরের বিস্ময়কর শিল্প-জীবনে স্তানিস্লাভস্কিকে দেখতে পাওয়া যাবে—পরিচালকের জন্ম থেকে তাঁর আগে পর্যন্ত প্রয়োগশিল্প যে বিশিষ্ট স্তরগুলি পার হয়ে এসেছে তিনি সেই স্তর ছুঁয়ে-ছুঁয়ে এসেছেন। তাঁর সমস্ত জীবনটা যেন পরিচালন পদ্ধতির বিবর্তনের সম্পূর্ণ

ইতিহাস। সব স্তরই তিনি অতিক্রম করে থিয়েটার-শিল্পের মূল সত্যানুসন্ধানে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় রেখে গেলেন।

তিনি চলা শুরু করলেন মাইনিঙ্গার-এর পথ ধরে। 'প্রডিউসার অটোক্র্যাট্' থেকে 'প্রডিউসার ইনস্ট্রাক্টর' হলেন তিনি অভিনয়শিক্ষার নতুন পন্থা আবিষ্কার ক'রে। মঞ্চসজ্জায়ও বহিরঙ্গের বাস্তবিকতা তাঁকে প্রথম আকৃষ্ট করল। তিনি কাজ শুরু করলেন বাস্তবনিষ্ঠ স্বাভাবিকতা নিয়ে—কিন্তু অবশেষে দেখতে পাওয়া যায় এই বাস্তবিক সত্যের সীমাবদ্ধতায় তিনি ক্লান্ত। তাঁরই তৈরি স্টুডিয়োতে দেখা যায় মায়ারহোল্ড—'রিয়ালিজম্' থেকে 'সিম্বলিজম্'-এর পরীক্ষা করে চলেছেন। স্তানিস্লাভস্কি তখন গভীর সত্য খুঁজে ফিরছেন নাট্যরীতির। এই অবস্থায় বাস্তবিকতা-বিরোধী দলের নেতা ক্রেগকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন মস্কো আর্ট থিয়েটারে। নানান্ পথ নানান্ মতের মধ্য থেকে সত্যানুসন্ধানী অস্থির মন তার পথের সন্ধান চাইছিল। অবশেষে তিনি বললেন: "After wandering about in search of new ways, we shall again return to realism fot more strength." কিন্তু এ কোন্ রিয়ালিজম্? উত্তরে বললেন: "refind and deeper realism." অন্য পথ নেই, যা আছে তা মিথ্যে, তা মৃত। এই নতুন অনুভূতির ফল পরিচালন পদ্ধতিতে দেখা গেল। নাট্যকারের লেখাকে প্রথম দিকে, কেবলমাত্র কল্পনাশক্তি বাড়াবার খোরাক হিশেবে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু নতুন বোধের উন্মেষণায় সে-ধারণা তাঁর পালটে গেল। নাটকের মূল বক্তব্যকে অস্বীকার করে নাট্য প্রয়োজনা অসম্ভব সে-কথা তিনি বলে গেলেন।

স্তানিস্লাভস্কির সবচেয়ে বড কীর্তি অভিনয়শিক্ষায় নতুন ধারার প্রবর্তনা। এই রীতির সার কথা অভিনেতার ব্যক্তিত্বকে ভূমিকায় সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দিয়ে অভিনেতা ও নাটকের মধ্যে একটা মরমী সম্বন্ধ স্থাপন করা। যে-অনুশীলনের কথা তিনি বলেছেন তা অনন্ত। তার সংযম কঠোর সাধনার মতোই। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচিত এই প্রণালী বিচার এবং বিশ্লেষণপন্থী। সমস্ত-কিছু ছক-কেটে পূর্বনির্ধারিত করার যে-রীতির প্রচলন হয়েছিল তার সঙ্গে স্তানিস্লাভস্কির তফাৎ এই যে তিনি স্বাভাবিক প্রযোজনায় আস্থাশীল। সৃজন সমবায়ের গণতন্ত্রের ওপর এর ভিত্তি।

অপরপক্ষে গর্ডন ক্রেগের মতো পরিচালকের ধারণা ছিল—অভিনেতারা কলের পুতুল ছাড়া অন্য-কিছু না। অভিনেতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অরাজকতা -

অখণ্ড শিল্পসাধনার পরিপন্থী। আর একদল পরিচালক আরো উগ্র মতের পরি-পোষক। তাঁরা ফিরে যেতে চাইলেন প্রযোজকের অনন্যতন্ত্রে। তাঁদের কাছে নটের উপস্থিতি দীপান্বিতার প্রদীপের মতোই সাজানো। রাইনহার্ট প্রমুখদের এই দলে ফেলা চলে। তাঁর সমসাময়িক জাঁক্ কোপোও আর-এক অনন্যতন্ত্রী। একটু অন্যধরনের প্রকাশ; তাঁর স্টেজ ম্যানেজারকে তিনি বললেন যে, পুরোনো পুঁথিপত্তরগুলো চাবি দিয়ে রেখেছি যাতে তোমরা সেগুলো ব্যবহার করতে ভুলে যাও। সেগুলো থেকে যা নেবার তা আমিই নেব—যে পরিচালনা করবে, বোঝাবে, এবং অল্প অল্প করে সঞ্চারিত করবে তোমাদের মধ্যে নতুন করে আমার ভগবান-প্রদত্ত অপ্রকাশিত বিজ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে। পুরোন দিয়ে পাদপূরণ নয়—নতুন সৃষ্টি, নতুন জীবন। কিন্তু রাইনহার্টের সঙ্গে তাঁর তফাৎও প্রচুর। কোপো তাঁর থিয়েটারের আদর্শ খুঁজলেন একটা নাটকীয় ছন্দের মধ্যে এবং মঞ্চের পশ্চাৎপট হিশেবে পাকা গাঁথনির স্থাপত্য ও বিভিন্ন স্তরের ছোট স্থায়ী প্ল্যাটফর্মবিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চের ব্যবহারে। রাইনহার্টের কথা হল 'একই নাট্যরীতিতে এবং একই ঢঙ বা ছন্দে নাটকের প্রকাশ অসম্ভব। তাঁর মতে একই গজকাঠিতে পৃথিবীর সাহিত্য-সম্পদকে মেপে এক ছাঁচে ঢালতে যাওয়ার চেষ্টা বর্বরতা। মায়ারহোল্ডের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের নানান্ গরমিলের মধ্যে মিলও অনেক। দু-জনেই দুই বিখ্যাত ন্যাচারালিস্ট পরিচালকের কাছে পাঠ গ্রহণ করেছেন। ব্রাহাম-শিষ্য রাইনহার্ট এবং স্তানিশ্লাভস্কি-শিষ্য মায়ারহোল্ড। দু-জনেই 'এক্স-প্রেশনিস্ট' নাটক নিয়ে জোর পরীক্ষা চালিয়েছিলেন।

নাটকের মধ্যে জীবনের সিম্বলিক প্রকাশ চেয়েছিলেন মায়ারহোল্ড। পরি-চালনার ইতিহাসে তাঁর বিশিষ্টতা নানান্ পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে সিম্বলের আবিষ্কার, তার ব্যবহার এবং একটা প্রচণ্ড নাটকীয়তা—যে-দুটোর সাহায্যে নাটক একসময় জনসাধারণের শিল্প হতে পেরেছিল। এই 'পিকাসো অব থিয়েটার' সারা জীবনভোর একটা স্টাইলের সন্ধানে তৃপ্তি খুঁজে বেড়িয়েছেন।

অতৃপ্তি থেকে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তার শেষ আজও হয়নি। পরিচালকের দায়িত্বের মধ্যে দর্শক তৈরি করার কাজ আজও বাকি আছে। কারণ দর্শক এবং মঞ্চের মানুষরা যাবৎ অনুভব না করবে যে তারা পরস্পরের জিজ্ঞাসার উত্তর—তারা থিয়েটারের সঙ্গে একাত্ম—তাবৎ নাট্যশিল্পের যথার্থ রূপ পাওয়া শক্ত। সেই কাজটাই উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যেই এতরকমের পরীক্ষা। এক্সপ্রেশনিজম্, ইম্প্রেশ-

নিজম্-এর অনেকানেক দুঃসাহসিক মঞ্চপ্রকাশভঙ্গি নিয়ে কাজ হচ্ছে এই শতাব্দীতেও। এইসব প্রচেষ্টার ফলে, আর যাই হোক্, ও-দেশে সাহিত্য ও প্রয়োগশিল্পে একটা পারস্পরিক প্রভাব বিস্তারের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তাই চেখভের রচনার গুণে যেমন পূর্বের অভিনয়রীতি পালটাতে হয়েছিল—তেমনি পিরানদেল্লোর নাটক অভিনয়ের জন্য রোমে প্রয়োজন হল নতুন নাট্যশালার বার্নার্ড শ-এর 'ব্যাক টু ম্যাথুসালা' অভিনয় প্রচলিত বাস্তবধর্মী দৃশ্যসজ্জায় সম্ভব হল না। ইংলণ্ডের মতো দেশেরও গোঁড়ামি ছেড়ে কলাকৌশলের দিকে মুখ ফেরাতে হল। ইওরোপীয় প্রভাবে আমেরিকার নাট্যশিল্পেও প্রভূত উন্নতি হল। ও'নীল 'এম্পারার জোন্স'-এর মতো নাটক লিখতে ভরসা পেলেন ও-দেশে আশা করা হচ্ছে যে নাট্য-প্রয়োগশিল্পে পরবর্তী ধাক্কাটা এই নতুন সাহিত্যের অনুপ্রবেশের মধ্যেই আসবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী এবং পর-বর্তী কয়েক বছরে ব্রেখট্ এক নতুন নাট্যাদর্শ স্থাপিত করলেন। এবং নিজে নাটক লিখে তার প্রযোজনা করে শুধু কবি-নাট্যকার হিশেবেই নয়, প্রযোজক-নির্দেশক হিশেবেও নতুন রীতির সন্ধান দিলেন। মঞ্চ, অভিনয় এবং দর্শকের মধ্যে একটা নতুন ভাবনা ও রীতি প্রবর্তনা করলেন।

ও-দেশের এই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই দেশে বাংলা নাটকে প্রয়োগশিল্পের ধারায় কোন ইতিহাস খুঁজতে যাওয়ার আগে স্মরণ করা ভাল যে, এখানে নাট্যশালার বয়স একশো বছর উত্তীর্ণ হয়েছে মাত্র। ও-দেশের খতিয়ানে দেখা গেল যে, কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসের পর যথার্থ নাট্য-পরিচালক এবং প্রয়োগ-আচার্যের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই এই সময় লেগেছিল। বাংলাদেশে দেশজ অভিনয়ের ইতিহাস অবশ্যই কয়েক-শো বছরের। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আমলে কৃষ্ণলীলা বা কৃষ্ণযাত্রার অভিনয়-মাধ্যমে এর চরম প্রকাশ। তার পূর্বে দেবোৎসবের অঙ্গ হিশেবে যে নাটগীতের প্রচলন ছিল তা সামাজিক রূপ এবং মর্যাদা নিয়ে চৈতন্যদেবের আমলে প্রথম যাত্রার রূপ পেল। স্বয়ং চৈতন্যদেবের সপার্ষদ এই যাত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার ঘটনাটি এর সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতিচিহ্ন হয়ে রয়েছে। 'চৈতন্যভাগবতে' জানতে পারি সে-কথা :

হেনই সময়ে সর্বপ্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আত্মাশক্তি বেশ ধর॥

কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
হেন অলক্ষিত বেশ অতি মনোহর॥

এ-যাত্রার অধিকারী একজন নিশ্চয়ই ছিলেন, এবং কল্পনা করি যে, সে অধিকারী স্বয়ং চৈতন্যদেব। সংগীতবিদ্যা বা নৃত্যেই অপূর্ব পারদর্শিতা ছিল তা নয়, সুদক্ষ অভিনেতাও ছিলেন তিনি। শ্রেষ্ঠ মহাজন বৈষ্ণব কবি থেকে আরম্ভ করে আঠারো এবং উনিশ শতকেও অবিস্মরণীয় যাত্রাওয়ালার দেখা পাওয়া গিয়েছিল। বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, লোচন অধিকারী, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি শক্তিমান্ অধিকারীর দল রাতের পর রাত কত আসর মাতিয়ে গেছে। কিন্তু এই অধিকারীদের যাত্রার ক্রমবিবর্তনের রূপেই যদি বাংলা নাট্যশালার জন্ম হত তাহলে হয়তো অধিকারীর বিবর্তনের ফলে নাট্যপরিচালকের জন্মও হত স্বাভাবিক স্রোতে। কিন্তু তা হয়নি। দুটো কারণে সম্ভবত যাত্রার স্বাভাবিক আবেদন হারিয়ে গেল উনবিংশ শতাব্দীর শেষে। প্রথম কারণ ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন এবং ইংরেজি রঙ্গালয়ের সঙ্গে নব্য বাঙালীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। যাত্রার প্রতি আকর্ষণের পরিবর্তে একটা বিরূপতা দেখা গেল। বিদেশী নাট্যশালা সাঁসুসিতে বাঙালী দর্শকের যাতায়াত চলল, সেইসঙ্গে রুচিও গেল পালটে। দ্বিতীয় কারণ, ঠিক এইসময়েই গোপাল উড়ে প্রমুখ অধিকারীদের আমলে ভেজাল ঢুকল যাত্রার মধ্যে। যে-প্রাণবন্যায় যাত্রার আবেদন, তা লুপ্ত হল নিম্নশ্রেণীর খেম্‌টা নাচ ও লঘু ভাঁড়ামির কুশ্রীতার মধ্যে, এবং এটাই যাত্রার একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। তৎকালীন 'বঙ্গদর্শনে' এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখতে পাই। মধুসূদন এই অবস্থার কথা ভেবেই বোধহয় লিখলেন :

"অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

অনিবার্যভাবেই যাত্রাকে নগর সীমানা পার হয়ে গ্রামে নির্বাসিত হতে হল, সেইসঙ্গে বাংলা যাত্রাভিনয়শিল্পের নিজস্ব ধারারও বিলুপ্তি ঘটল। "চৈতন্যদেবের পর এর জন্ম, রাজা রামমোহন রায়ের পর ইহার মৃত্যু।" ('বঙ্গদর্শন'।)

বাংলা রঙ্গালয়ের, বাংলা নাটকের, বাংলা মঞ্চাভিনয়ের জন্ম হল। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রাথমিক অবস্থায় পুরো অভিনয়ানুষ্ঠানকে একজন তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টি দিয়ে সুচারু, সুসংগত করার দাবী উঠলই না। কারণ মুখ্যত এদের অভিনয়ানুষ্ঠান তখন অন্ধ আকাঙ্ক্ষার ফল। বিদেশী রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে এসে পয়সাওয়ালা কিছু এদেশী গুণী লোকের ইচ্ছা জাগল নিজেদের রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা

করার এবং বেলগাছিয়া, পাথুরেঘাটা, চড়কডাঙা, জোড়াসাঁকোতে বিদেশী অনুকরণে নিজেদের বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ তৈরির মধ্যেই এই ইচ্ছা রূপ পেল। আকাঙ্ক্ষার অপর দিকটা এরই সঙ্গে যুক্ত, সেটা ওই মধুসূদনের মতো কিছু প্রতিভাধর 'অলীক কুনাট্যরঙ্গে'র অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে নাটক লিখতে কলম ধরলেন। এবং নাটক লেখাও হল। কিন্তু এহ বাহ্য। সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস শুরু আরও পরে—যথার্থ প্রযোগ-আচার্যের সাক্ষাৎ তারও পরে।

এই পর্বের শুরু নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষকে দিয়ে। তিনি মূলত কবি ও অভিনেতা। নাট্যশালার প্রয়োজনের খাতিরেই তাঁকে রঙ্গালয়ের ম্যানেজার হতেইহয়েছিল। বোধকরি এই কারণেই তাঁকে বাংলার 'গ্যারিক' বলা হল। কিন্তু তুলনা করলে তাঁকে মলিয়েরের সঙ্গেই করা উচিত। যে-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মলিয়ের প্যারীর রঙ্গমঞ্চ চালিয়েছিলেন সেই কবি ও অভিনেতার দৃষ্টি নিয়ে বাংলায় নাটক উপস্থিত করলেন গিরিশচন্দ্র। বিদেশী অনুকরণের মাঝে কত তর্ক, কত আলো, কত তলোয়ার, কত প্যাঁচ, স্টেজের ওপর অট্টালিকা, গাড়ি, ঘোড়া, নদী, পাহাড় কত কাণ্ডের মাঝে তিনি একটা কথা বুঝেছিলেন যে যাত্রার পালাগানের মধ্যে যে সর্বসাধারণগ্রাহ্য সহজ আবেদনটি ছিল তা হারিয়ে গেছে তাঁর সমসাময়িক মঞ্চাভিনয়ে। যাত্রায় ফিরে যেতে চাননি তিনি কিন্তু পৌরাণিক নাটক লিখে মঞ্চে তার অভিনয়ের যে রীতি প্রবর্তন করলেন তা হারিয়ে-যাওয়া আবেদনটিকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষাতেই। কিন্তু যে-কারণে মলিয়ের এবং গ্যারিককে আধুনিক অর্থে পরিচালক বা প্রয়োগ-আচার্য বলা হয়নি গিরিশচন্দ্রের ক্ষেত্রেও সেই একই কারণ। বলা বাহুল্য, পথিকৃৎ হিশেবে এঁদের স্বীকৃতি সর্বজনগ্রাহ্য। অমৃতলাল প্রমুখ গুটিকয়েক নাট্য-শিক্ষক বা অভিনয়-শিক্ষক এবং মঞ্চাধ্যক্ষের সাক্ষাৎ আমরা পাই, কিন্তু পরিচালকের, প্রযোজকের সাক্ষাৎ তখনও দূর অস্ত।

এই দূরকে প্রত্যক্ষ করা গেল, শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে মঞ্চের যোগাযোগের সন্ধিক্ষণে। তিনিই প্রথম বাংলা থিয়েটারের প্রয়োগশিল্পী, যথার্থ পরিচালক। নাট্যপ্রয়োগ ক্ষেত্রে, পরিচালন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর আবির্ভাব। মঞ্চে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে নাট্যকার কথিত এবং অকথিত বাণীকে উপস্থাপন নৈপুণ্যে বহন করে নাটকের গভীরতা এবং গতিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। নাটকে যা বলা আছে তার চেয়ে বেশি বললেন তিনি তাঁর নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে।

তাঁর অনুষ্ঠানেই প্রথম প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভল—পট উঠল অন্ধকারে—মঞ্চের আলোয় দৃশ্যপট দেখা গেল—দর্শক অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের পাশাপাশি অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে অভিনয়ের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করল। অবশ্য প্রথম অভিনয়ে প্রেক্ষাগৃহের আলো নেভাতে বিড়ম্বনাও হল অনভ্যস্ত দর্শকবৃন্দের চেঁচামেচিতে। 'সীতা' নাটকে এ-ঘটনা ঘটল। কিন্তু একটা উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠল নাটকের শুরুতে। দৃশ্যপটেও নতুনত্ব আনা হল। গুণী শিল্পীকে দিয়ে পট আঁকান হল। মঞ্চে আঁকা পটেও একটা গভীরতা এল—একটা 'ডায়মেনশন্' পাওয়া গেল। সর্বত্র একটা মার্জিত পরিচ্ছন্ন রুচিতে লোকের চোখ তৃপ্ত হল। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকে আলোর ব্যবহারে নাটকীয়তা সৃষ্টি হল। 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে শিশিরকুমারের পরিচালন-নৈপুণ্য ও প্রয়োগ-বৈচিত্র্য চরম রূপ পেল। নাট্যকার যোগেশবাবুর সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আছে এ-নাটকের মুখবন্ধে। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক্ শিশিরকুমার থেমে গেলেন।

এরপর আরও কয়েকজন চেষ্টা করলেন এবং 'মহানিশা' নাটকে আবার একবার পরিচ্ছন্ন উপস্থাপনের নমুনা পাওয়া গেল। নাট্যভারতীকে কেন্দ্র করে কয়েকজন অভিনেতা এবং একজন নাট্যকার পুনরপি চেষ্টা করলেন, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে অভিনেতা ও নাট্যকার হিশেবে তাঁরা খ্যাতিমান্ হলেও পরিচালক ও প্রযোজক হিশেবে তাঁদের দক্ষতা অতিমাত্রিক ছিল না। তাই একটা জায়গায় এসে বাংলা নাট্যশিল্প মুখ থুবড়ে পড়ে আটকে গেল। তারপর গত যুদ্ধের পটভূমিকা। গোলাবারুদের ধোঁয়ায় তখন আকাশ-বাতাস ঘুলিয়ে উঠল। তুলনা করলে বলা চলে থিয়েটারের অবস্থাটা আবার যাত্রার নাভিশ্বাসের পর্বে এসে দাঁড়াল।

এরই মধ্যে একদল মানুষের নতুন ভাবনার ফলে 'নবান্ন'র অভিনয় হল। বাংলা প্রয়োগশিল্পে একটা নতুনত্বের আস্বাদ পাওয়া গেল—সম্পূর্ণ নতুন। থিয়েটারের দর্শকের চোখ বদলাল, মন বদলাল, রুচি বদলালো, ভাব বদলাল। পালা-বদলের দিন শুরু হল। 'নবান্ন'র পর থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত অপেশাদারী প্রচেষ্টায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা। অভিনেতার যুগ অতিক্রম করে এই পর্ব থেকেই আমরা প্রবেশ করলাম নির্দেশকের যুগে।

মন্ত্র আর মতে তফাৎ অনেক। গুরু মন্ত্র দিলেন শিষ্যের কানে শিষ্য মন্ত্র জপ করে অভিষ্টলাভের জন্যে নানা মতে বিভক্ত হয়ে নানা পথের সন্ধান করতে লাগলেন। একই গুরুর শিষ্য—মোক্ষের সন্ধানে কেউ-বা গেলেন কৌপীন সম্বল ক'রে কেদারবদরীর পথে, কেউ-বা গরদের জোড় পরে শ্বেতপাথরের মন্দিরে। উদ্দেশ্য এক—ঈশ্বরপ্রাপ্তি।

ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি শিল্পের ক্ষেত্রেও মন্ত্র আর মতে পার্থক্য অনেক। শিল্পীকেও তার শিল্প নিয়ে নানা মতের নানা পথে চলতে হয়েছে। মন্ত্রের মধ্যে আছে অভিন্নতার আভাস, মতের মধ্যে ভেদের। সেই ভেদাভেদের আবর্তে মতের ফাঁকিতে মন্ত্র যায় হারিয়ে। অথচ শিল্পের মন্ত্রের মধ্যেই আছে সত্য এবং তথ্য। শিল্পের প্রকাশ হওয়া উচিত সহজ সরল অনাড়ম্বর—অথচ তা গভীর, ঐ বস্তু! শিল্প প্রকাশের চরম ফসল! নানা মতের মধ্যে গ্রহণ ও বর্জন দ্বারা সুষ্ঠু সমন্বয়ই বোধহয় পথ। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি মঞ্চ-শিল্পেও এ-কথা সত্য। হয়তো একটু বেশি করেই সত্য। এখানেও মতের ভিড় অনেক। মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে, মত আর আঙ্গিকের ভিড়ে বুঝি-বা থিয়েটারের মন্ত্রই হারিয়ে গেল। অন্তত থিয়েটারের ইতিহাসে যত 'ইজম্' ভিড় করেছে সারি-সারি, তা আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রমের সৃষ্টি করে বৈকি। এই ভিড় যেমন ভয়ের তেমনি ভরসারও। ভরসার কথা, কেননা কোন একটা বা দুটো মত আঁকড়ে ধরে রাখলে বোঝা যেত থিয়েটার তেমন সচল নেই—না চললে নয়, তাই বোধহয় চলছে। মতের আধিক্যে একটা নিরন্তর অস্থিরতা প্রকাশ পেলেও সে-অস্থিরতার সঙ্গে অন্বেষার যোগ বর্তমান। হয়তো সত্যকে আবিষ্কার করবার জন্যে এ-অস্থিরতা, মন্ত্রকে স্মরণ করার জন্যেই এই অন্বেষণ। তাই থিয়েটারের বিভিন্ন মত ও তার পরিবর্তন আলোচনার যোগ্য। বেশি করে আলোচনার যোগ্য এইজন্যে যে, আমাদের এখানে বর্তমানে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস দেখা দিয়েছে তাকে ইতিহাসের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। নবনাট্য আন্দোলনে পথনির্দেশেই

ইতিহাসের সার্থকতা।

শিল্পশাস্ত্রের সূত্র ধরে থিয়েটারের আলোচনা করা চলে, কেননা থিয়েটারও শিল্প, অন্তত আর্ট থিয়েটার তাই। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে সে-আলোচনায় প্রবেশ করা যায়। তিনি বললেন, "শিল্পশাস্ত্রে মত ও মন্ত্র দুইয়েরই স্থান আছে। মতগুলো জানাবে আমাদের মতধারিক অবস্থায় শিল্প কখন কী মূর্তি ধরলে, কী প্রণালীতেই রচিত হল মূর্তি চিত্র ইত্যাদি এম'ন নানা কথা। আর মন্ত্রগুলো জানাবে শিল্প-সাধনার রস-সাধনার পন্থার উদ্দেশ, যা দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বদলায় না এমন সব শিল্পের বিষয়ে নিগূঢ় সত্য ও তথ্য।"

সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ে মঞ্চ-শিল্প সম্পর্কে যথেষ্ট এবং প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া দুষ্কর। আর বাংলাদেশে আধুনিক আন্দোলন নির্ভিক্ষু দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার সময় এখনও আসেনি। তাই দেশের বিবরণের বদলে বিদেশের দ্বারস্থ হতে হল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশেষ করে একই মরশুমে ইউরোপের থিয়েটার-রাজধানীগুলিতে বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রকাশ হয়েছে। সে রীতি, প্রথা-প্রকরণ কোথাও রিয়ালিস্টিক কোথাও সিম্বলিস্টিক, একসপ্রেশনিস্টিক — আবার সুররিয়ালিস্টিক অন্য কোথায়ও-বা। অস্থির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যুগ-লক্ষণ এটা। কিন্তু এরই মধ্যে বহু লোক সৃষ্টির পদক্ষেপ শুনতে পাচ্ছেন, আবার কেউ-বা ক্ষয়ের যুগ বলে অভিহিত করেছেন একে।

এই দলই বলছেন থিয়েটার মরে গেছে। সে তার সংযোগ হারিয়েছে। অভিন্নতার মন্ত্র থিয়েটার আর স্মরণ করতে পারছে না। আধুনিকতার নামে যা হচ্ছে তা আন্তর-মেলায় পাঁচমিশেলি চাকচিক্যের বাহার। শুধুমাত্র চমক সৃষ্টি। তাঁদের এ-হতাশা সত্য। বহিরঙ্গের চাকচিক্য দিয়ে ভোলাবার চেষ্টাটা নিঃসন্দেহেই সমালোচনার যোগ্য। শিল্পের পথ বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ দুটো রূপের প্রত্যক্ষণেই।

এইসময়কার ও-দেশের নাট্যানুষ্ঠানের ইতিহাস এবং বিবর্তনটা জানা থাকলে আঙ্গিকের নানা বিভ্রান্তির মধ্যে থেকেও একটা সাধারণ সত্যে উপনীত হতে বাধা নেই যে, মূল দুটো'ধারা এর মধ্যে বর্তমান: বিদ্যমান রূপের প্রতিচ্ছবি — যাকে বলি ন্যাচারালিজম্, রিয়ালিজম্ — আর অন্য ধারাটা অবিদ্যমান রূপের পরীক্ষা থিয়েটারের স্টাইলাইজেশনের মাধ্যমে।

থিয়েট্রিক্যালিজমের আধিক্যে এবং শিল্পে 'slice of life' প্রকাশের

আহ্বানে থিয়েটারের যে সাড়া-জাগানো তা মূলত ফরাসী সাহিত্যিকদে প্রেরণায়। বালজাক্ যা শুরু করলেন নাটকে এমিল্ জোলা তার চূড়ান্ত কর লেন। ফরাসী মঞ্চের পূর্বতন ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করতে ভিক্টর উগো প্রতিবাদ করে ছিলেন এককালে—'মঞ্চে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিকে টেনে আনা থিয়েটারে পাপ'। এমিল্ জোলা উলটো সুর গাইলেন: সত্যের নামে ওই প্রাত্যহি জীবনের খুঁটিনাটিকেই মঞ্চের সিংহাসনে স্থান দিলেন। বোধহয় ভুল করলেন শিল্পের সমস্ত ধারণাটাকে অস্বীকার করে তিনি বললেন, শিল্প বস্তু এবং জীবনে প্রতিরূপ। অভিনেতারা অভিনয় করবে না—স্টেজে জ্যান্ত হয়ে দেখা দেবে দর্শক-সমক্ষে।

সাহিত্যের প্রভাবটা থিয়েটারে বিশেষ করে মঞ্চশিল্পে এনে জোলার যোগ শিষ্য হয়ে দেখা দিলেন প্যারিসে আঁতোয়া তাঁর 'থিয়েতর লাইবর' প্রতিষ্ঠা ক'রে এই থিয়েটার এবং স্তানিস্লাভস্কির 'মস্কো আর্ট থিয়েটার' কাজ শুরু করার আগে পর্যন্ত থিয়েটারের সংস্কার হয়নি বহুদিন। মঞ্চে রিয়ালিজম্ প্রবর্তনার প্রথম দিকে ফোটো-যন্ত্রের রূপ ধরবার ক্ষমতায় নিবদ্ধ ছিল সব শিল্প। থিয়েটারে তার প্রভাব পড়ল থিয়েট্রিক্যাল প্রথা ভাঙবার চেষ্টায়। যুক্তিটা ওই ন্যাচারালিজম্ এর মঞ্চসজ্জার মধ্য দিয়েই পুরোন প্রথায় প্রতিবাদটা প্রকট হয়ে উঠল। এর আগের রোমান্টিকরা পোশাক-পরিচ্ছদে এবং মঞ্চসজ্জায় ঐতিহাসিক কালটাকে ধরবার চেষ্টা করেছে। তার ফলে শেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনয়ে ঐতিহাসিক সঠিকতাটা কেবল বজায় রইল মাত্র। গ্যাস এবং বিজলী বাতির আবিষ্কার মঞ্চে সাহায্য করল অনেক—কিন্তু প্রযোজনার আঙ্গিক একই থাকল। দৃশ্য সজ্জায় সেই পুরোন ধারায় আঁকা ফ্ল্যাটগুলো পার্সপেক্টিভে সাজান রইল। অর্থাৎ অভিনেতা আঁকা পর্দার কাছে গেলেই আকৃতির সমতা হারিয়ে ফেলত।

নতুন বস্তুবাদীরা একঘেয়ে কৃত্রিমতার ওপর বীতস্পৃহ হয়ে উঠলেন। প্রথম ধাক্কায় এই কৃত্রিমতা হটাতে গিয়ে প্রসিনিয়াম ডোর এবং য়্যাপ্রন্ স্টেজ উঠে গেল। ওপরে সিলিং এবং তিন দিকে দেওয়াল-ঢাকা ঘর হল মঞ্চে। ফোর্থ-ওয়াল সম্পর্কে সচেতন হল থিয়েটার। দর্শক হল আড়ি পাতার দল। বাস্তবিক-তার বিভ্রম সৃষ্টি করতে আঁকা দৃশ্যপটের বদলে মাত্রা-বিশিষ্ট ঘন সিনারি ব্যবহার করা শুরু হল। দরজাগুলো সত্যিকার দরজা, পাল্লাগুলো সত্যিকার হাতল ঘুরিয়ে খোলা চলতে লাগল। দর্শকরাও থিয়েটারের অস্বাভাবিক পরি-বেশে বাস্তব জিনিস দেখতে প্রলুব্ধ হলেন।

ছবির রিয়ালিজম্ নাট্যদৃশ্যেও প্রচলিত হতে লাগল। নাট্যকারও রূঢ় বাস্তব বোঝাতে প্রায়শই জীবনের খুঁটিনাটি এবং রূঢ়তাকে ফোটাতে চাইলেন। আধুনিক মঞ্চপরিচালকের গুরু যাঁকে দিয়ে সেই ডিউক অব্ সেক্সেমেনিন্জেন মঞ্চে নিখুঁত বাস্তব আমদানি করতে মৃত্যুর দৃশ্যে সত্যিকার মরা ঘোড়া ব্যবহার করেছিলেন। এবং এ-ব্যাপারের কাজী আঁতোয়া ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কসাইখানার দৃশ্যে সত্যিকার মাংস ঝুলিয়ে বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করবার অজুহাত দিলেন। আমেরিকাতে ডেভিড বেলাস্কো তাঁর প্রযোজিত নাটকে সত্যিকার পানশালা, টেলিফোন, লাইনোটাইপ মেশিন, এস্কেলেটার (যান্ত্রিক সিঁড়ি) ব্যবহার করেছেন।

প্রাচীন ভারতের মঞ্চ-প্রয়োজনায় অর্থাৎ সংস্কৃত নাটকের দরবারী পরিবেশে কী হত জানা নেই। তবে শিল্পশাস্ত্রে 'slice of life' প্রকাশের সমর্থন মিলছে—'সশ্বাসমিব যৎচিত্রং তদ্‌চিত্রং শুভলক্ষণং'। ভারতীয় শিল্পের নানা জাতের মধ্যে এটিও একটি। বাস্তবের প্রতিরূপ চিত্রই শুভ। উলটো মতটা অবশ্যই অনুপস্থিত ছিল না এই ভারত-শিল্পশাস্ত্রে। অবনীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, ভারতশিল্পে দুটো মতেরই প্রচলন ছিল। ভারতীয় নাট্যমঞ্চে তার ব্যবহার কী ছিল তা জানতে পারলে সুবিধা হত। ধরে নেওয়া যাক, এই মতধারিক ভারত-বর্ষের মঞ্চেও প্রকাশ করেছিলেন বাস্তবিকতা।

যাই হোক, ও-দেশে আধুনিক কালে ন্যাচারালিজম্ পর্ব যখন শৈশব অতিক্রম ক'রে পরিণতির পথে তখন ঐ প্রজ্ঞার আলোয় 'যথাযথে'র সঙ্গে শিল্পের, অর্থাৎ ন্যাচারালিজম্ এবং আর্টের মাঝে বিরোধটা ধরতে পারলেন। শিল্প 'অরূপের রসের বার্তা সমস্ত পৌঁছে দিলে দর্শকের মনে। তবেই তো হল কাজ'।

বিবর্তনের পথে আধুনিক থিয়েটার এই পর্বের উপান্তে যখন পৌঁছল তখন দেখা গেল উগ্রতা অনেক ক'মে গেছে। ন্যাচারালিজম্ পথ ক'রে দিয়েছে selective realism-এর। যে ফোটোচিত্রের উল্লেখ করে শিল্পের সঙ্গে বাস্তবিকতার প্রভেদ বোঝান হয় ক্ষণে-ক্ষণে—যেমন খবরের কাগজের উল্লেখ করা হয় হামেশা সাহিত্যের স্থান নির্ণয়ের জন্য—সেই ফোটোচিত্রও আধুনিক-কালে শিল্পের মন্ত্রের ছোঁয়াচ পেয়েছে! যে-কোন আধুনিক ফোটোগ্রাফিক প্রদর্শনীতে তার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

ন্যাচারালিস্টিক আন্দোলনের চূড়ান্তে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় এবং বিশেষ করে প্রতীকী কবিতার প্রভাবে এবং

'কলাকৈবল্যবাদে'র ঢেউয়ে নতুন একটা ধারার উৎপত্তি হল: ভাবব্যঞ্জনায় স্টাইলাইজেশনের। তত্ত্বে এবং ব্যবহারে এরা প্রাক্-ন্যাচারালিস্ট, রোমান্টিক এবং রিয়ালিস্টের দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মঞ্চে এঁরা নির্ভর করলেন ঐক্য এবং আঙ্গিকের বাঙ্ময়তার ওপর। ন্যাচারালিস্টিক থিয়েটারের সঙ্গে এর তফাৎ, এরা জোর দিলেন সাংকেতিকতার ওপর, 'স্বল্প রেখায় অনেক প্রকাশের ওপর', poetry of mood এবং বিভিন্ন স্তরের প্রতীক ব্যবহারের ওপর। 'সিম্বলিজম্' বলা হল এই রীতিকে। এবং পরিচালক ও পটশিল্পীরা এ-তিলোত্তমাশিল্পকে ভ্যাগনের-এর থিয়েটারের আদর্শ—'a perfect synthesis of the arts'-এর মর্ম অনুসরণে মঞ্চকে সাজাতে লাগলেন। আর্ট থিয়েটারের মধ্যে এই আন্দোলন লালিত হতে লাগল। ন্যাচারালিজম্-এর প্রতিক্রিয়ায় সিলেক্টিভ রিয়ালিজম্ ছাড়াও সৌন্দর্য এবং আত্মিক সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য থিয়েট্রিক্যালিটি পুনরপি আবির্ভূত হল। নিও-রোমান্টিক ও সিম্বলিস্ট নাট্যকারের সহযোগিতায় প্রযোজকরা মঞ্চে কল্পনা এবং কাব্য-প্রকাশের জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। ফরাসী কবি পল ফোর্ট ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'থিয়েতর দ্য আর্ত' প্রতিষ্ঠা করে প্রথম সিঁড়ি তৈরি করলেন। মেটারলিঙ্কের প্রথমদিককার প্রতীক-ধর্মী নাটকানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আঁতোয়া-শিষ্য Lugne Poe Theatre de L'Quemere-এর উদ্বোধন করলেন। এই মেটারলিঙ্কের নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে 'মস্কো আর্ট থিয়েটারে' স্তানিস্লাভস্কি যখন প্রচলিত মঞ্চব্যবস্থায় খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না তখন আকস্মিকভাবে মঞ্চে কালো ভেলভেট পর্দার (নীল রঙের স্কাই, ফ্লাই, উইংস, পিছনের পর্দা ইত্যাদির বদলে) ব্যবহারের কথা মাথায় এসে মঞ্চে আর-এক নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করল। ম্যাক্স রাইনহার্ট হচ্ছেন আর-একজন দলত্যাগী যিনি স্টাইলাইজেশনের দিকে ঝুঁকলেন। ন্যাচারালিস্ট প্রযোজক অটোব্রাম্-এর অধীনে ইনি পূর্বে অভিনয় করতেন। মধ্য-ইওরোপে এই ভদ্রলোক দীর্ঘদিন সাফল্যের সঙ্গে নানান্ আঙ্গিক অবলম্বন ক'রে মঞ্চাভিনয়ের চেষ্টা করেছেন।

মোটকথা, ন্যাচারালিস্টিক মতবাদীদের অনেকেই বেশিদিন বাস্তবানুগ মঞ্চ-ব্যবস্থায় আত্মার তৃপ্তি খুঁজে পেলেন না। আবার নিছক প্রতীকধর্মও চিরকাল বজায় রইল না, সেটাও প্রমাণ হল। মধ্যপথেই প্রতীকীদের সঙ্গে বাস্তববাদী-দের একটা বোঝাপড়া হল, বা বলা যায়, রিয়ালিস্টরা সিম্বলিস্টদের শিল্প-নৈপুণ্য আত্মস্থ করে নিলেন কিছু পরিমাণে। "মস্কো আর্ট থিয়েটার" মেটারলিঙ্ক ধরলেন।

গর্ডন ক্রেগের মতো অতি-মেধাবী আকরিককে 'হ্যামলেট' প্রযোজনার জন্য মস্কো আর্ট থিয়েটার আমন্ত্রণ জানালো। এই পর্যায়ে অর্থাৎ রিয়ালিজমের সঙ্গে স্টাইলাইজেশনের শুভ পরিণয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধ্রুপদী উদাহরণ বোধহয় Jacques Copeau। মঞ্চে প্রতীকী ধর্মের প্রভাব বাড়াতে তিনি শুরুতে রিয়ালিস্টদের বিরুদ্ধে শাণিত খড়্গ ধারণ করলেন। অবশ্য অল্প দিনের মধ্যে স্তানিস্লাভস্কি-প্রবর্তিত অভিনয়ের আন্তর-রিয়ালিজমের সঙ্গে তাঁর সরল অনাড়ম্বর আঙ্গিকের একটা রফা করলেন। মঞ্চেও গ্রহণ-বর্জন চলল। এলিজাবেথান রীতিতে পুনরায় য়্যাপ্রন স্টেজ হল। পেছনে ফাঁকা মঞ্চে স্থায়ী থাম এবং সিঁড়ি ব্যবহার করে নতুন প্রথা প্রচলন করলেন। এই মঞ্চস্থাপত্য সত্যিকারের ঘরের প্রতিরূপকে মুক্তি দিল ইঙ্গিতের মধ্যে। ফরাসী মঞ্চে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল এই সময়ে। মঞ্চসজ্জায় পিকাসো, মাতিস্ প্রভৃতি নিও-রিয়ালিস্ট আঁকিয়েদের সাহায্য নেওয়া হল। প্রকাশের যে মাধ্যমটা একান্তভাবেই make-belief তাতে বাস্তবের যথাযথ প্রতিরূপ সৃষ্টির চেষ্টাটা যে অযৌক্তিক এবং অপব্যবহার—এ-ধারণাটা ক্রমশই চাড়িয়ে উঠল।

থিয়েটারে নতুন কতকগুলো কনভেনশন্ সৃষ্টি হল। এই থিয়েটারি প্রথা বাস্তবের ইলুশন সৃষ্টির চেষ্টা নয়, দর্শককে মনে করে নিতে সাহায্য করার ইঙ্গিত মাত্র। মঞ্চের চতুর্থ দেওয়ালটা নেহাৎই ফাঁকা জায়গা। স্বর্গত ভূমেন রায় প্রখ্যাত হয়েছিলেন ফিরিঙ্গি সাহেবের পার্টে। মঞ্চে রিয়ালিটির নাম করে তাঁর সমস্ত সংলাপ যদি বিদেশী ভাষায় বলানো হত তবে ফল কী হত অনুমান করা যায়। স্বাভাবিক অভিনয় 'স্বাভাবিক' নাটকের মতোই বাস্তবের সত্যকে লঙ্ঘন করে কেবলমাত্র বাস্তবের ছাপটা দেবার জন্যেই।

আমাদের শিল্পশাস্ত্রে এই মতের সপক্ষে কিছু বলা আছে। এবং বোধকরি তারই সূত্র ধরে মঞ্চে প্রথাসৃষ্টির কিছু উদাহরণও দেওয়া যায়। এইটা ভারতশিল্পে দ্বিতীয় মত "সলক্ষণং মর্তবিম্বং ন হি শ্রেয়স্করং সদা।" প্রতিরূপ শিল্প নয়—প্রতিমাশিল্পের সপক্ষে যুক্তি এটা। মর্তবিম্ব শিল্পে সুখকর নয় শ্রেয় নয়, শুভও নয়।

খুব স্বল্প উদাহরণ, কিন্তু আন্দাজ দেবে মঞ্চপ্রথার। সংস্কৃত নাটকে একটা মঞ্চনির্দেশ—'রাজা রথারোহণং নটয়তি'। রাজা মঞ্চে যদি সত্যিকার থি-পিস্ প্লাইউডের রং-করা রথে চাপতেন তবে এ-মঞ্চনির্দেশ অর্থহীন। রাজা রথে আরোহণ করার অভিনয় করলেন। ঐটাই convention। দর্শকরা সেই প্রথার

বিশ্বাস করত। 'শকুন্তলা' নাটকের শুরুতে সারথি দুষ্মন্তকে রথে নিয়ে আসছেন। সংলাপ আছে সে রথের তীব্র গতিবেগের চলমান দৃশ্যের ও সৌন্দর্যের। অধিকারী সে-আমলের দরবারী অভিনয়-আসরে এ-জায়গায় কী আঙ্গিক ব্যবহার করতেন? অন্তত back projection করে-করে চলচ্চিত্রের গতি দান করেননি নিশ্চয়ই। একটা মঞ্চপ্রথা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু কী সে-প্রথা? অবশ্য মাঝে-মাঝে সত্যি-কার রথ এবং ঘোড়াও নাকি মঞ্চে আনা হত। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভি-নেতাই রথের এবং ঘোড়ারও কাজ চালিয়ে দিত এ-ও এক মঞ্চপ্রথা। শকুন্তলার মুখে এক দুষ্ট ভ্রমর প্রলুব্ধ হয়ে বারবার উড়ে বসতে চাইছে —শকুন্তলা বিরক্ত হয়ে বারবার তাকে প্রতিহত করছেন। শকুন্তলা এ-অভিনয়টা নিশ্চয়ই করে-ছিলেন কিন্তু সত্যিকার ভ্রমর নিশ্চয়ই মঞ্চে ওড়ানো হয়নি। টুকরো উদাহরণ আরও হয়তো দেওয়া যায়।

সময়ে ন্যাচারালিজম্ পথ ছেড়ে দিল সিলেক্টিভ রিয়ালিজম্-এর জন্য, এ-কথা তো বলা হল। কিন্তু মঞ্চে সিলেক্টিভ রিয়ালিজম্টা কী? সংক্ষেপে বলা যায়—এই মতে সত্যিকার জিনিশ ব্যবহার হল ততটুকুই যতটুকু দিয়ে বাস্তবের একটা ধারণা সৃষ্টি করা করা যায়। অনাবশ্যক যাথার্থ্যের আমদানি মঞ্চে শুভ নয়, শ্রেয়ও নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, 'শকুন্তলা'য় দুষ্মন্ত যেখানে গাছের ফাঁক দিয়ে চুরি করে শকুন্তলাকে দেখছেন সেখানে অভিনয়ের সময় মঞ্চে একটা আস্ত গাছের গুঁড়ি বসাবার দরকার কী? ওটা অভিনয়েই প্রকাশ পাবে। দর্শককে মঞ্চপ্রথায় অজ্ঞ মনে করার কোনও যুক্তি নেই।

সিলেক্টিভ রিয়ালিজম্-এর পাশে আরও একটা আঙ্গিক প্রাধান্য পেল, যেটাকে বলা যেতে পারে "সংশোধিত সিম্বলিজম্"। অবশ্য এ-দুয়ের মাঝে তফাৎটা সুস্পষ্ট করে বলা মুশকিল। বিংশ শতাব্দীর এক্সপ্রেশনিজম্, কন্স্ট্রাক্-টিভিজম্, ফিউচারিজম্; সুররিয়ালিজম্ এবং ব্রেখটের 'এপিক থিয়েটার' পর্যন্ত যাবতীয় আঙ্গিকের প্রকাশ ন্যাচারালিজমের ওপর বীতরাগ থেকেই সম্ভব হয়েছে।

এই আঙ্গিকগুলি সবই যে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বেতালা প্রকাশ তা নয়—যদিও কয়েকজনের চরম 'ইজম্' ঐ-কথাটাই প্রকাশ করেছে। ব্রেখটের 'এপিক থিয়ে-টারে' মঞ্চাভিনয় যে শুধুমাত্র সুবিন্যস্ত সমাজপ্রকাশে বা নৈতিক পারম্পর্য রক্ষা করতে পেরেছে তাই নয়—রিয়ালিজম্ এবং সিম্বলিজমের সমন্বয় চেষ্টাও করেছেন তিনি। [illegible]

'ক্ষয়ের পথে নয়, থিয়েটারের সামগ্রিক রূপ প্রকাশের পথে—যে-পথে প্রথা এবং বাস্তবভ্রম যথাযথ অনুপাতে ব্যবহৃত হয়ে সকল রকম convention বাদ দিয়ে নতুন এক প্রথা সৃষ্টি করবে।

প্রত্যেক দেশে তার নিজস্ব প্রথা তৈরি হবে। সেই প্রথায় সে-দেশের জীবনের একটা সুনির্দিষ্ট স্বাভাবিক মান মঞ্চ-মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভ করবে। এইভাবে একদিন কোন এক বা একাধিক নাট্য-নির্দেশকের হাতে আমাদের দেশেরও এক মঞ্চপ্রথা তৈরি হবে যেখানে মন্ত্র হবে, 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীং অনন্যপরতন্ত্রাং নবরসরুচিরাং নির্মিতিম্ আদধতী ভারতী কবের্জয়তি'—নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা, আনন্দের সঙ্গে একীভূতা, অনন্য-পরতন্ত্রা নবরসরুচিরা নির্মিতি ধারিনী যে কবি ভারতী তার জয় হোক্। এই-যে বাক্য এ শুধু কথার কথা নয়, কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য, সঙ্গীত নৃত্য, নাট্য, দেশের সব শিল্পের পুজারীর জন্যই এই মন্ত্রপূত পঞ্চপ্রদীপ। মতের ফুৎকারে কোনদিন নেভবার নয়, কেননা রসের সত্যমন্ত্র এটি!' – অবন ঠাকুরের এই অভিজ্ঞান কি তখন পথ দেখাবে?

শব্দ / প্রতীক ও তিলোত্তমাশিল্প

আজকের কলকাতা শহরে চতুর্দিকে এত শব্দ, এত কোলাহল, এত আওয়াজ যে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালালে সম্ভবত একটা সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারব যে বছর-চল্লিশ আগে মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয় যত বেশি সূক্ষ্ম শব্দ ধারণ করতে পারত আজ তার সে-ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেছে। আমার আশঙ্কা আমাদের ইন্দ্রিয়টি লুপ্ত হতে বসেছে। এ এক অদ্ভুত বৈকল্য।

এ-ব্যাপারে সামাজিক সমীক্ষা একদিন-না-একদিন কেউ করবেন। আমি থিয়েটার সংক্রান্ত একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। এ-উল্লেখ কিছুটা আপন অভিজ্ঞতা খানিকটা প্রাচীন মানুষদের কাছ থেকে শোনা। এই কলকাতার কথাই ধরা যাক্। এখানে বিশ, ত্রিশ কিংবা চল্লিশ বছর আগে থিয়েটার বা যাই হোক্ না কেন কোন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেই কয়েক হাজার মানুষ খোলা মাঠে অনায়াসেই শুনতে পারত। আজ আর তা সম্ভব নয়। কেন পারে না সেটা উল্লেখ করছি। শব্দ বা আওয়াজের ব্যবহার এমনই প্রচণ্ড এবং কর্কশ, এমনই সুরসংগতিহীন যে মানুষ শব্দকে উপেক্ষা করতে পারলে স্বস্তিলাভ করে। ফলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা লোপ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শব্দ নিয়ে কিছু আলোচনা করতে সংকোচ বোধ করছি। আজকের থিয়েটারেও আওয়াজের প্রাবল্য বোধ করি এই একই কারণে বেড়ে গেছে। অথচ মানুষ যখনই সামাজিক জীব হয়ে গেল তখনই, নিশ্চয়ই শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহার করে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছিল। কালক্রমে তাই ভাষায় এবং কথায় রূপান্তরিত হয়েছে। শব্দকে অর্থপূর্ণ করে তারই চিত্ররূপ ভাষা। কোন কিছুকে অপরের কাছে জ্ঞাপন করা বা প্রকাশ করার জন্যেই ভঙ্গি, আওয়াজ বা দেহভঙ্গি কখন-কখন কথার চেয়েও বেশি প্রকাশক্ষম, তবু প্রায়শই তা স্বচ্ছতা এবং নির্দিষ্টতা প্রকাশে অক্ষম। নিজের অনুভবকে তাই কথা দিয়ে মানুষ অপরের কাছে প্রকাশ করতে পারে এবং তাদের বোঝাতে পারে।

তাই প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় হিসেবে কথাকেই অবলম্বন করা হয়েছে এবং

তা আজ পর্যন্ত অপরিহার্য বলেই বিবেচিত। এর অন্য কোন সহায়ক নেই—কেবলমাত্র কণ্ঠস্বর ছাড়া। তাই যে-কোন আবেগ অনুজ্ঞা প্রকাশ করতে কথাকে সহায়ক করতে হয়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে কেবল কথাই কি সব। কথা শুনবার লোকও দরকার। যে শুনছে সে কি সংবেদনশীল কান নিয়ে তৈরি? কিংবা যে-শব্দ উচ্চারণ করছে তার কণ্ঠস্বর কি শ্রোতার সংবেদন যন্ত্রকে উদ্দীপ্ত করছে? নাট্যশিল্পে এ-প্রশ্নগুলি শব্দের ব্যবহারের সঙ্গেই যুক্ত।

এই শব্দের সঙ্গে নৈঃশব্দ্যের কি একটা যোগসূত্র নেই? আছে। নিঃশব্দ মুহূর্ত যে আগে-পরে উচ্চারিত শব্দকে আরও তাৎপর্যমণ্ডিত করে দিতে পারে। শব্দের বিশুদ্ধ উৎপত্তির সঙ্গে নিঃস্তব্ধতার চচাও যে প্রয়োজন! অপরকে শোনান এবং নিজেকে শোনান এ দুই-ই উচ্চারিত শব্দের তাৎপর্য বহন করে। কিন্তু শব্দের তাৎপর্য তো শ্রোতাকেও বুঝতে হবে। নইলে তার প্রকাশ যে ব্যর্থ হবে। কেননা শব্দ তো শব্দেই শেষ নয়—তার কাজ তো অর্থ সঞ্চার করা। কী সঞ্চারিত করবে সে? যা আমি প্রকাশ করতে চাইছি? নাট্যের মধ্যে যা প্রকাশ করবার যোগ্য।

কণ্ঠস্বর কার্যত দেহগত ভঙ্গির প্রকাশক্ষমতার উর্ধ্বে। যে-অনুকম্পন শব্দ থেকে উদ্গত তা সোজাসুজি কানের দুয়ারে এসে ধাক্কা দেয়। চোখ তো দূর থেকে দেখছে। দেহভঙ্গিতে যে-গতি সঞ্চারিত হয় তার থেকে কণ্ঠস্বরের গতি-ভঙ্গিমা আরও জটিল। আমরা জানি নাট্যশিল্পে মঞ্চের ওপর আলো, রেখা, রঙ, এবং গতি সঞ্চার ইত্যাদি নিয়ে আধুনিক কালে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। এগুলির স্বতন্ত্র প্রকাশক্ষমতাও সীমাহীন ব'লে স্বীকৃত। কিন্তু যা এককালে—সেই নাট্যশিল্পের আদিকালে—একমাত্র বা অন্যতম প্রকাশ-মাধ্যম ব'লে স্বীকৃতি পেয়েছিল—সেই শব্দ যা কণ্ঠনির্গত, তা অনেকাংশেই আজ পূর্ণ গৌরবে বিরাজ করছে না। এই কণ্ঠস্বরেরও গতি আছে, রেখা আছে। সেই গতি এবং রেখা যদি সঠিক হয় তাহলে এই শব্দের ক্ষমতা আজও অপরিসীম। একটা সাঙ্গীতিক প্যাটার্নের মধ্যেই এর বিচরণ। সঙ্গীতের যে-শব্দ, বাজনার যে-আওয়াজ তার মধ্যেও এই গতি ও ছন্দ আছে। সেই গতি এবং ছন্দই আমাদের আকর্ষণ করে। শব্দের মুক্তির জন্য আজকে অনেকে সচেষ্ট। বাঁধাধরা নিয়মের বাইরে তাকে মুক্ত করতে চাইছেন অনেকে। ইলেক্ট্রনিক মিউজিকের মধ্যে নাকি তার সম্ভাবনা।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিশিষ্ট ধারণাটা কতকগুলি বাঁধা-

ধরা কাঠামোর মধ্যে নাটকে ছিল। বাঁধাধরা শব্দলহরী। ছন্দের বৈচিত্র্য এনে ছিল 'আজ' সঙ্গীত। বর্তমানে সেখানে একটা বন্ধনহীন বিপ্লব শুরু হয়েছে শব্দের জন্ম দিতে সেখানে যে-কোন বস্তুর ওপর আঘাত দিয়ে তা করা হচ্ছে একটা টিনের পাত, লোহার খণ্ড বা পাইপ, খাবার প্লেটে বা কিছুর ওপর আঘাত দিয়ে শব্দ তৈরি করা হচ্ছে। কেবলমাত্র আঘাত দিয়ে নয়, ঘর্ষণ করে, ভেঙে ফেলে যে-কোন উপায়ে শব্দের সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমাদের 'রক্তকরবী' নাটকে খালেদ চৌধুরী মশায় এ-রকম বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন করেছেন এবং সফল হয়েছেন। এই শব্দ কেবলমাত্র আওয়াজ নয়, সঙ্গীত। ও-দেশে কোন-কোন নাচের অনুষ্ঠানে আবহসঙ্গীত কেবলমাত্র আবহ সৃষ্টি করতে তৎপর নয়—ত নৃত্যানুষ্ঠানের সহযোগী হয়ে উঠেছে। দেহভঙ্গির ছন্দ, লয় এবং মুভমেন্টের সঙ্গে শব্দের নিঃশ্ছিদ্র মিতালী তৈরি হয়েছে।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত নাট্যশিল্পে মূল অবলম্বন কথা অর্থাৎ অর্থপূর্ণ শব্দ। অন্য উপকরণ অভিনেতার ভঙ্গি, মুভমেন্ট, দৃশ্যপটের রেখা, রঙ, আলো। এগুলি কি ওই উচ্চারিত শব্দের সহযোগী বা একাত্ম হয়ে ওঠে? যেখানে ওঠে সেখানে নাট্যশিল্পের সার্থকতা।

আজকের আধুনিক নাট্যভাবনার একটি মূল ধারা হল—'নাট্যাভিনয়' এই কথাটা যে-অর্থে এতদিন ব্যবহৃত হয়ে এসেছে তা মোটেই নয়, এই বিশ্বাস। থিয়েটারের টেকনিক্ যখন থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তখন থেকেই থিয়েটার হয়ে উঠেছে একটা সুন্দর মেকানিজম্। কোন জোরজবরদস্তি নয়, 'আপনাতে আপনি বিকাশ' এইরকম একটা প্রবাদে বিশ্বাসী। এবং এই শিল্প তিনটি মুখ্য উপাদানে গঠিত। 'এ্যাকশন', 'সিন' এবং 'ভয়েস্'। এ-ক্ষেত্রে 'এ্যাকশন' হল গতি এবং ছন্দ, গন্ধ এবং কাব্যের ক্রিয়া। 'সিন' বলতে যাবতীয় যা-কিছু পরি-দৃশ্যমান্—আলো, সজ্জা এবং দৃশ্যপট। আর কণ্ঠস্বর।

যা বলা হচ্ছে বা গীত হচ্ছে এবং যা পঠিত শব্দের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা লেখা হয়েছে বলবার জন্য এবং যে-শব্দ কেবলমাত্র পড়বার জন্য লেখা হয়েছে তা সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। ভেবে দেখবার মতো কথা। এবং নাটকে শব্দের ব্যবহার এই অস্তি-মেধাবী উক্তিটিকে মনে রেখেই করতে হবে। কে অস্বীকার করবে যে জীবনের পরিদৃশ্যমান্ সৃষ্টি হ'ল নাটক। এবং যতক্ষণ 'শব্দ' না শোনা যাচ্ছে ততক্ষণ নাটক ছবির মতোই। বস্তুত তাই-ই। কিন্তু নাট্যের মুখ্য প্রদেশ যে শব্দ দিয়ে সাজানো।

শব্দের ঝংকারে বা পৌনঃপুনিক ব্যবহারে যে-ছন্দ তৈরি হয় তার একটা নেশা আছেই। সেই নেশা-ধরানো শব্দসমষ্টি কি ইতিহাসের আগের কোন কালে রাত্রির আকাশের নীচে ব'সে অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে একদল মানুষ উচ্চারণ ক'রে মাতাল হয়ে যায়নি! আজও কি 'বোল হরি হরি বোল' বা 'জয় সিয়ারাম'-এর সাঙ্গীতিক কাঠামোর পুনরাবৃত্তি আমাদের নেশা ধরায় না? কিংবা এই অতি-চিৎকৃত উলঙ্গ অসভ্য কলকাতায় সি এম. ডি.এ.-র রাস্তা খোঁড়ায় বিরক্ত, ক্রুদ্ধ পথচলতি মানুষ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে না—যখন সেই রাস্তা-খোঁড়া শ্রমিকরা একটা অর্থহীন শব্দসমষ্টি নিখাদে ধ'রে 'সা'-এ নামিয়ে নিয়ে এসে একই তালে কোন ভারী জিনিশ ওঠাচ্ছে বা নামাচ্ছে "হেঁইয়ো মারে হেঁইয়ো" অথবা "এক-এক জনের দো-দো হাত—হেঁইয়ো মারো হেঁইয়ো" কিংবা "এ—মুঘলে আজম্ জিন্দাবাদ"—ইত্যাদি কতকগুলি প্রায় অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ ক'রে; পাঁচ-জনে মিলে একটা সুর সৃষ্টি করছে—একটা নেশা-ধরানো পরিবেশ তৈরি করছে। আমাদের থিয়েটারে সেই প্রাচীন সামাজিক সম্মেলনের আদিসূত্র শব্দকে কি আমরা কাজে লাগাতে পারি না। এ-প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে।

জীবন যদি 'এ্যাকশন' হয় এবং নাটকে সেই জীবনের 'এ্যাকশন'কে যদি দেখানো হয়—তাহলে, একটা চিন্তা—অর্থপূর্ণ উচ্চারিত শব্দ দিয়ে তো অনেক কাল চলল, এবারে সেই 'এ্যাকশন' অনূদিত হোক্-না কতকগুলি শব্দের মধ্যে। প্রত্যেকটা 'এ্যাকশনে'র তুলনীয় শব্দের প্রতিরূপ পাওয়া যেতে পারে। একটা কাগজ ছিঁড়ে ফেলা হল—একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ভঙ্গি। ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী এই কাগজ ছেঁড়ার কাগজ একটা 'মেটাফর' হয়ে উঠতে পারে। এই 'মেটাফর' একটা চিহ্ন এবং ইলাস্ট্রেশনও। এবং সেইহেতু এটাও একরকম ভাষা। কথা বলার সুর, যে-কোন রিদমিক্ প্যাটার্নও ভাষার অংশ এবং তা বিভিন্ন ভাবকে প্রকাশ করছে।

সঙ্গীতও একটা ভাষা। দেখা যায় না, কিন্তু অনুভূত হয়। ঘোষণা ক'রে বলা বা আবৃত্তিধর্মী অভিনয় সঙ্গীত নয়, তবু সাধারণ কথার সঙ্গে এর তফাৎ আছে। কোন এক প্রখ্যাত আধুনিক পরিচালক গ্রীক ট্র্যাজেডির অভিনয়-কালে দীর্ঘ ছন্দোবদ্ধ আবৃত্তিকে আরও উচ্চগ্রামে বেঁধে দিতে পেরেছিলেন—সেই আবৃত্তির সঙ্গে 'পারকাশন' যন্ত্র ব্যবহার ক'রে। এই সঙ্গীত সেই দীর্ঘ আবৃত্তিকে 'পাংচুয়েট্' করেছে এবং সহযোগিতা করেছে। বিবরণে দেখছি ফল অভাবিত।

এ তো কথিত শব্দের সহযোগী শব্দ। কিন্তু ধরা যাক্ একটি আধুনিক নাটক, এই কলকাতাকে নিয়েই নাটক। ধরা যাক্ সেই ১৭৯৫ থেকে এই বর্তমানকালকে নিয়ে কোন নাটক। যেখানে হতাশা, ক্রোধ, হিংসা, লোভ একত্রে বাসা বেঁধে রয়েছে।. কথা দিয়ে সাজিয়ে অনেক নাটক হয়তো হয়েছে। কিন্তু কল্পনা করা যাক্ এমন এক নাটক যেখানে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ শব্দ খুব স্বল্প। নাটকে যা আছে অর্থাৎ বেশি ক'রে আছে – কতকগুলো শব্দ, অর্থহীন শব্দ, চীৎকার, উল্লাসের – নৃশংস উল্লাসের আওয়াজ, বেদনার স্বর – আর সেইসঙ্গে অভিনেতাদের এ্যাকশন, কম্পোজিশন, এবং কিছু কথা, কিছু ছন্দায়িত ভঙ্গি। এগুলোকে পাংচুয়েট করছে কিছু উদাত্ত কণ্ঠের – না, কথা-সমৃদ্ধ গান নয়, কেবল সরগম সাধা। আমি জানি না কেউ এমন দুঃসাহস করবেন কিনা। তবে বিশ্বাস করি যদি কোন প্রকৃত স্রষ্টা এমন পরীক্ষা করেন তবে শব্দের একটা অনুবাদ-ক্ষমতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা হতে পারে। এ-ক্ষেত্রে এ্যানার্কি অবশ্যই প্রশ্রয় পাবে না। বিচারবুদ্ধি অনুশীলন এবং চিন্তার ক্ষমতার ওপর এর সাফল্য নির্ভর করছে। সত্যজিৎ রায় ফিল্মে শব্দের যাথার্থ্য প্রমাণ করেছেন শব্দের অসাধারণ প্রয়োগে। শম্ভু মিত্র 'চার অধ্যায়', 'রাজা' এবং 'রক্তকরবী'তে মঞ্চে শব্দের অপরিসীম ক্ষমতার নিদর্শন রেখেছেন।

এবারে প্রশ্ন উঠতে পারে অর্থপূর্ণ শব্দের কি অপমৃত্যু ঘটেছে। এ-শব্দ দিয়ে কি আর কমিউনিকেট করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি বিশ্বাস করি না যে বাংলা ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা হারিয়ে গেছে। ভাষার অর্থমৃত্যু ঘোষিত হয়ে থাকতে পারে অন্য কোন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। আমরা এখনও রবীন্দ্রনাথের ভাষাকেই সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের নাটকের যে-শব্দগুণ, সঠিক উচ্চারিত হলে তার যে-প্রকাশক্ষমতা তা অন্তত 'চার অধ্যায়' 'রক্তকরবী' 'রাজা' নাটক অভিনয় করে প্রমাণিত হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ একমাত্র উপায় নয় – সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরের ব্যাপ্তি, গভীরতা, অনুভবের ক্ষমতা এবং এই ভাষার অন্তর্নিহিত যে-সঙ্গীত তাকে প্রকাশ করতে কখনো মীড়ের টানে, কখনো লয়ের দ্রুততায় কখনো সংক্ষিপ্ততায়, কখনো-বা নীরবতার আশ্রয় নিতে হয়।

শব্দের ক্ষমতা অসীম – কিন্তু সে-ক্ষমতা তো শাসক নয়, যে ভাষার শাসন-ক্ষমতা হারিয়ে গেছে ব'লে আক্ষেপ করব। কবে ভাষা শাসন করেছে, বা অন্যায়কে রুখে দিতে পেরেছে? আজ তাই এ-কথা বলা সাজে না যে উচ্চারিত

ভাষা দিয়ে অন্যায়কে রোখা যাচ্ছে না, দুঃখকে দূর করা যাচ্ছে না : অতএব এ-শব্দরূপ পরিত্যাজ্য! এ-শব্দরূপে জীবন প্রকাশিত হয়েছে নিশ্চয়ই। জীবনের শান্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে নিশ্চয়ই। জীবনকে বুঝতে সাহায্য করেছে অবধারিতভাবেই। সে-ক্ষমতা তার এখনও আছে।

অভিনয় এবং আবৃত্তির কারবার শব্দকে নিয়ে। শব্দের উচ্চারণ, শব্দের ভাব, শব্দের রূপ এমন-কি রঙ— এই নিয়ে খেলা চলে আবৃত্তিতে। অভিনয়ে।

প্রাচীন পদার্থবাদী শাস্ত্রীরা শব্দকে শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি গুণ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির মত শব্দও একটি বিশেষ গুণ। তাঁরা শব্দকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন,— ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। পদার্থের অভিঘাত বা বিভাগ দ্বারা যে-শব্দ অর্থাৎ আওয়াজ সৃষ্টি হয় তাই ধ্বনি। আর কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ প্রভৃতি শরীরস্থানের সংযোগ বিভাগ থেকে উৎপন্ন শব্দ বর্ণাত্মক। আবৃত্তি ও অভিনয় প্রসঙ্গে এই বর্ণাত্মক শব্দই ব্যবহৃত। কিন্তু তাঁদের কাছে শব্দের ব্যাপ্তি আরও ব্যাপক। আদিতম শব্দের রূপটি কানে ধরা পড়ে না— তা থাকে হৃদয়ের আকাশে, চিন্তায়, ভাবনায়,— ক্রমপর্যায়ে সেটা প্রকাশিত হয় ইন্দ্রিয় স্তরে, তখন আমরা শুনতে পাই। সুষম স্পন্দনে যে-শব্দের উৎপত্তি তাই গান হয়ে ওঠে, তাই আবৃত্তি হতে পারে। যদিও এ দুয়ের ব্যবহারিক প্যাটার্নটা আলাদা। শব্দের সুষম স্পন্দনে আবার নানা রূপ প্রকাশ পায়। এই স্পন্দনের সঙ্গে ভাবের এবং রসের নিবিড় সম্পর্ক। কোন স্পন্দনে জাগে বিপদ, কোন স্পন্দনে বা হর্ষ, কোন স্পন্দনে আবেশ, আবার কোন স্পন্দনে জাগরণ।

যে-সংলাপ আমরা উচ্চারণ করি বা যে-কবিতা আমরা আবৃত্তি করি সে-ক্রিয়া মূলত অর্থ ও ধ্বনির সমন্বয়ে নিষ্পন্ন হয়। বাংলাতে শব্দ বলতে দুটো অর্থ বুঝি। এক ধ্বনি, আরেকটা অভিধা। তাহলে কবিতার শরীর গড়ে ওঠে যে শব্দ দিয়ে— সে-শব্দ ওই ধ্বনি ও অভিধার সমন্বিত রূপ। কবিতার অন্তর্নিহিত গানে নিছক ধ্বনির ভূমিকা থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু কবিতা আবৃত্তিতে কথার তাৎপর্যনিরপেক্ষ কোন ধ্বনি থাকতে পারে না। তাই কণ্ঠস্বরের যে উত্থান-পতনের খেলা গানে দেখানো যায় কবিতা আবৃত্তিতে সে-খেলার কোন অবকাশ নেই,— যা আছে তা হল শব্দের যে মূল ধ্বনিরূপ তাকে প্রকাশ করার দায়। কবিতা আবৃত্তিতে ধ্বনি কথার তাৎপর্যকে প্রকাশ করছে মাত্র। সেখানে ধ্বনি শুধু অবলম্বন বা বাহন,— সংগীতের মত স্ব-প্রধান নয়।

আবৃত্তি সম্পর্কে গ্যয়টের মন্তব্য : এ হল স্বরের উত্থান-পতন যুক্ত বাচন-

প্রথা। কবির আদর্শ এবং কাব্যের বিষয়বস্তুর নানা রসগত পার্থক্য আবৃত্তিকারের মধ্যে যে-ভাবের সৃষ্টি করে সেই ভাব সে তার কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে প্রকাশ করে। এর জন্য তার নিজের স্বভাব অথবা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে বর্জন করতে হয় না। আবৃত্তি এবং অভিনয় সম্পর্কে তিনি অবশ্য বলেছেন, যে 'এ দুটি এক নয়। আবৃত্তি একটি বিশেষ ধরনের কথন।

আবৃত্তি সম্পর্কে প্ল্যাটোর মন্তব্য এবং এ সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত যত মানুষ আলোচনা করেছেন তার মূল কথাই হল কেবলমাত্র কণ্ঠস্বরের অভিব্যক্তি দিয়েই আবৃত্তির শরীর গড়ে তুলতে হয়। স্বর এবং সুরের বিস্তারের মূল ভিত্তি হল প্রত্যেক স্বরগ্রামের সঠিক শুদ্ধ ব্যবহার—তেমনি আবৃত্তির মূল প্রত্যেকটি শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ। উচ্চারণ শুদ্ধ হবে তখনই যখন প্রতিটি বর্ণ উচ্চারণে তার সম্পূর্ণ মর্যাদা পাবে। কিন্তু আবৃত্তি বা অভিনয় যেহেতু গান নয়—তাই স্বরগ্রামের ব্যবহারটা একেত্রে আলাদা। আমরা যে কথা বলি তা একরকম স্বরগ্রামে বাঁধা। কিন্তু তা গানের স্বরগ্রামের রেখাচিত্র থেকে আলাদা।

কিছু-কিছু মানুষের কথা শুনতে ভালো লাগে আবার কারো কথা শুনতে ইচ্ছে করে না। শুধুমাত্র সুকণ্ঠের অধিকারী হলেই চলে না, সেই সঙ্গে অভিব্যক্তিসক্ষমও হওয়া চাই—তবেই সে-কণ্ঠস্বর বা কথা মনকে এবং কানকে তৃপ্তি দেয়। তখনই ইচ্ছে হয় এই আওয়াজ আরও শুনি। এটা ঘটে উচ্চারণ-স্পষ্টতা আর কণ্ঠে ধ্বনিবৈচিত্র্যের গুণে। বড় বাড়ীর দালানে দাঁড়ে ঝোলানো যে কাকাতুয়া কিংবা গ্রামের বোষ্টমী বাড়ীর দাওয়ায় খাঁচার ময়না যে-কথা বলে তা হয় শেখানো বুলি, কিংবা অনুকৃত অর্থহীন শব্দসমষ্টি। কিন্তু কবিতার ভাষা আমরা শেখানো বুলির মতো বলি না। যখন বলা হবে তখন যেন সেটা সৃষ্টির কাজ হয়। সেই সঙ্গে যেন তা আজকের বোধকে তৃপ্তি করে।

কিন্তু নাট্যশিল্পে রূপ পরিবর্তন যদি অবশ্যম্ভাবী হয় - যদি ঠিক হয়ে যায় যে কথিত ভাষা ছাড়াও এর একটা সুনির্দিষ্ট সুষম জৈব রূপ দেওয়া যায় তবে তা স্বাগত। সেই অনিবার্যতা আগে অনুভূত হোক্—তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশ্যই চলবে। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে, নাট্যশিল্পে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ শব্দের মহিমা বিনষ্ট হয়নি ব'লেই বিশ্বাস করি।

নাট্যশিল্পের দেহে একাধিক শিল্পরূপ সমন্বিত হয়েছে। এবং তা অন্বিত হয়েই একটা স্বতন্ত্র শিল্প ব'লে গণ্য হতে পেরেছে। তাই একে 'তিলোত্তমাশিল্প' বলছি। বস্তু-সত্য থেকে যখন শিল্প-সত্য রূপ পায় তখনই তার অঙ্গে প্রতীককে

আবিষ্কার করি। সেটাই হয়ে ওঠে ভাবসত্য। তখন আমরা সিন্ধুকে উপলব্ধি করি বিন্দুর মধ্যে। কাব্যের লক্ষণে এটা প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ সংগীতে, নৃত্যে। বাক্‌-শিল্প—যা ভাষাশিল্পের শব্দরূপ—তার আদি যে বর্ণমালা এবং বাক্যের বা শব্দের উচ্চারণেও প্রতীক। আর এইসব আনুষঙ্গিক শিল্প নিয়েই নাট্যশিল্প গ'ড়ে

প্রতীককে যদি সংকেত বলি এবং ইংরেজি প্রতিশব্দ যদি 'সিম্বল' হয় তা-হলে তার মূল রূপ 'সিম্বালাম্‌'—যার অর্থ সমাহৃত করা—একত্রীকরণ। গুণধর্মের একত্রীকরণ। এ-অর্থে নাট্যশিল্প নিজেই প্রতীক। প্রতীকের অপর ব্যাখ্যা কোন বস্তু-চিহ্ন—যার থেকে লক্ষণাশক্তির বলে নিগূঢ় তাৎপর্য ফুটে ওঠে। বিষয়কে ব্যাখ্যা করে, চিত্তাকর্ষক করে, অবচেতন স্মৃতিকে জাগ্রত করে। এছাড়া অন্য অর্থ যা পাওয়া যায় তা হল—অলংকরণ, বাস্তব থেকে পলায়ন। উদাহরণ দেওয়া যাক্‌ ইবসেন, চেখভ এবং রবীন্দ্র-নাটক থেকে। 'এ ডলস্‌ হাউস'-এ চিঠি, 'হেডা গেবলার'-এ পিস্তল, 'ওয়াইল্ডক্‌'-এ হাঁস, 'সি গাল'-এ মৃত পাখি এবং 'রক্তকরবী'তে রাজার জালের দরজা, মরা ব্যাঙ, নন্দিনীর ধানি রঙের শাড়ি, সিঁথিতে রক্তকরবীর মঞ্জরী—এ সবই 'বস্তু' এবং এই বস্তুর লক্ষণাশক্তি নিগূঢ় তাৎপর্য নিয়ে ফুটে ওঠে এবং বিষয়কে ব্যাখ্যা করে। রবীন্দ্র-নাটকে পথও কোন-কোন সময় প্রতীক হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু আলোচনা খণ্ড হলে আলোচিত বস্তুও খণ্ডিত হয়ে যায়। যেমন ধরুন নাট্যশিল্পের অন্তর্গত মঞ্চসজ্জা নিয়েই যদি কথাটা ওঠে তবে সে-সজ্জায় আধুনিক কালে প্রতীকের ব্যবহার অপ্রতুল নয়। কোথাও একটা ক্যাক্‌টাস্‌, কোথাও শুকনো রজনীগন্ধার গুচ্ছ, কোথাও-বা সংকটের ক্রমঘনীভূত রূপ প্রকাশে মঞ্চ-সজ্জার রঙের পরিবর্তন। এ সবই সম্ভব হয়েছে চিত্রশিল্পের মূল ভাব আহরণ করতে পারার মধ্যেই। আমরা চিত্রশিল্পের কাছ থেকে ধার করেছি সমান্তরাল লম্ব এবং বক্র রেখার ব্যবহারে কীভাবে ভাববস্তুকে স্পষ্ট করে সেই জ্ঞান। তখন ওই রেখার প্রাধান্যে কখন শক্তি, দম্ভ, কখন প্রশান্তি, আবার কখনও অস্থিরতা প্রকাশের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

মঞ্চবিন্যাস এবং চিত্রায়ণ—এই দুই কাজ, যেমন মঞ্চসজ্জায়, তেমনি অভিনেতাদের বিন্যাসের কৌশলে অনেক সময়েই প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। অভিনেতাদের দেহগত অবস্থান, মঞ্চক্ষেত্রের ব্যবহার এবং গতি বা মুভমেণ্ট—এ দিয়ে যখন ভয়, হতাশা, উল্লাস, আরাম বা শান্তিকে রূপ দেওয়া যায়, তখন তো

সেগুলো প্রতীক হয়েই দাঁড়ায়। মুভমেন্ট—যা নৃত্যকলার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে—তা-ও তো একভাবে প্রতীক। মুদ্রার ব্যবহার তো বটেই এবং মুভমেন্টের রেখা দিয়েও ব্যঞ্জনা আনা সম্ভব।

মঞ্চসজ্জায় রঙের ব্যবহারের কথা বলেছি—পোশাকের রঙও তাৎপর্য বহন করে। এবং মঞ্চে আলোকসম্পাতে যে-বর্ণ ব্যবহৃত, তা-ও। এ-সবের বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই কেননা এগুলো সংশ্লিষ্ট সকলেরই অধিগত। কেবল এ-সবের প্রয়োগের বিভ্রাট বা অতিপ্রয়োগ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, শিল্পের সূক্ষ্মতা হারায়।

শিল্পের কাছে আমরা কী চাই? সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি কিংবা অপর কোন নীতি? আমরা একজন সমাজবেত্তার কাছে যা জানতে পারি, একজন রাজনীতিবিদের কাছে, যে জ্ঞানলাভ করি ধর্মগুরুর কাছে, তা-ই কি শিল্পের ক্ষেত্রে এসেও আমরা জানতে আগ্রহী? বোধহয় না। তাহলে সব জানা, সব বোঝা ওই ওঁদের কাছেই সম্পন্ন হত। হয় না ব'লেই মানুষ শিল্পের দরজায় এসে দাঁড়ায়। যে-ইঙ্গিত, যে-সংকেত, যে-ব্যঞ্জনা, যে-গভীরতার আকাঙ্ক্ষায় এবং আনন্দের আশায় তারা এ-দরজায় আসে — তা ওইসব পণ্ডিতদের কাছে তারা পায় না। এখানে যা পাওয়া যায় — তা কিন্তু ওই ইঙ্গিত এবং ইশারা। সেই ইশারায় তাদের অন্তরের প্রদীপ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তথ্য নয়, জ্ঞান নয়,—তত্ত্বের ইশারা এবং আনন্দ, যেমন ধরুন, নাট্যঘটনায় একজনের সন্তান-বিয়োগ-দৃশ্য রয়েছে। নাট্যসাহিত্যে সে শোকাবহ ঘটনা বাস্তবের হুবহু অনুকরণে বিশদ খুঁটিনাটি নিশ্চয়ই লেখা হয় না—লেখা হয়—অন্তত ভাল নাটকে—সেই শোকের নির্যাস। সেখানে অনেক, প্রতীকী ব্যঞ্জনা ভাষায়। মহৎ শিল্পী, যিনি সে-ভূমিকায় অভিনয় করবেন তিনি তাঁর সংহত শোকের রূপ প্রকাশে অনেক সংযম আয়ত্ত ক'রেই প্রকাশ করবেন, বাস্তবের হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কান্না তাঁর নেই। তিনি বেছে নিয়েছেন, অনাবশ্যক বাদ দিয়েছেন, একটা প্রতিমা কল্পনা দিয়ে তিনি তৈরি করবেন—সেই প্রতিমাকে আদর্শ ক'রে একটা মঞ্চরূপ নির্ধারণ করবেন। তখন সেটা অনেকের সমধর্মী শোকের একটা প্রতীক হয়ে দাঁড়াবে। মঞ্চসজ্জায় এবং আলোয় রঙের রেখায়, একটা শূন্য খাটের বাজু ধ'রে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষটির চাহনিতে, বিছানার বালিশটাকে হাত দিয়ে ছোঁবার মুদ্রায়, খাটের পায়ার কাছে ব'সে পড়ার দেহগত ভঙ্গি এবং রেখায় সেই শোক তখন রূপ পায়।

শিল্পে একটা দূরত্ব রচিত হয় বাস্তব থেকে। তাই যখন কবি কোন প্রিয়-

জনের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেন, শোক যখন চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে তখন তিনি কবিতা লেখেন না—লিখলে সেটা হয়তো পন্ড হয়ে যায়। কিন্তু যখন বেদনার ঝড়টা কেটে গেছে—অর্থাৎ যখন ঘটনাটা দূরবর্তী হয়েছে, হৃদয় যখন শান্ত হয়ে এসেছে, তখনই সে বিয়োগের কাব্যে অনেক প্রতিমা অনেক প্রতীক প্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। অভিনেতার আবেগের ক্ষেত্রেও তাই। প্রতীকী নাট্য সম্পর্কে এখানে আলোচনা হয়। কেননা তা সাহিত্যের বিষয়। তবু চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা যায় কেননা চরিত্র মঞ্চে অভিনেতার সৃষ্টি—দিও তা নাট্যসাহিত্য থেকেই নেওয়া। আমরা প্রত্যেকেই একজন, অর্থাৎ এক ব্যক্তি—অবশ্যই সামাজিক ব্যক্তি—হিশেবেই পরিচিত। আমাদের চেনাজানা পরিধির মধ্যে আমার অন্য কোন পরিচয় নেই। তারা যে সকলেই কাছে থেকে দেখে। আবার আমরা সবাই এক নই, বিভিন্ন। ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, মহৎ, সাধু ইত্যাদি। এটা সাধারণ মানুষদের সম্পর্কেই বলা। জীবৎকালেই যাঁরা প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র, বা যাঁদের মহত্ত্ব বা বিরাটত্ব কিংবদন্তী হয়ে যায় তাঁদেরও। এছাড়া বাদবাকী আমরা সকলেই ব্যক্তি। কিন্তু ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তিই যখন ভিন্ন-ভিন্ন চরিত্ররূপে মঞ্চে বিচরণ করি তখন দর্শক দূর থেকে দেখবার সুযোগ পায়। এবং সেই চরিত্র নামধেয় 'বস্তুটি' তখন 'বস্তুচিহ্ন' হয়ে যায়—যার লক্ষণাশক্তির বলে বিশেষ চরিত্র নির্বিশেষ রূপ পায়। দর্শক হিশেবে আমরা দেখি একটি বিশেষ চরিত্রকে—কিন্তু মনের মধ্যে অনেকের চরিত্রের সঙ্গে সে মিলে যায়। তখন চেনা-জানা অনেক চরিত্রের প্রতীক হয়ে ওঠে সেই চরিত্র। ভাল নাটকের ভাল অভিনয় দেখতে-দেখতে এ-অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অনেকেরই হয়েছে।

নাট্যশিল্পের জন্মলগ্নেই তা মানুষের আকাঙ্ক্ষারপ্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেই আদিম সমাজে 'রিচুয়্যাল' বা 'কৃত্য' থেকে নাট্যাভিনয়ের জন্ম—এ-কথা মেনে নিয়েছেন অনেকে। সে শস্যকৃত্যই হোক্ বা অন্য কোন কৃত্যই হোক্। মানুষ তার বাঁচার অনুষঙ্গে এইসব অনুষ্ঠান করত। শিকার বা শস্য উৎপাদন এ দুই-ই তখন সেই সমাজের বাঁচার উপায়। সেই উপায় অনুষ্ঠানে রূপ পেত অনেক প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যাভিনয়ের পর্বে যে-সব অনুষ্ঠান হত এবং মঞ্চকে যেভাবে কল্পনা করা হত তাও প্রতীক। ধ্বজদণ্ড বা ইন্দ্রধ্বজ-তো অশুভ শক্তির হাত থেকে মঞ্চানুষ্ঠানকে রক্ষা করার সংকল্প এবং প্রতীক। জর্জর দণ্ডের স্থাপনা দিয়ে যে-নাট্যানুষ্ঠান সূচনা হত তা প্রতীকী ঘটনা এবং

পুরো নাট্য—নাট্যগৃহ, অভিনয় সবটাই—জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপ হয়ে ওঠে এবং তখনই অনেক 'বস্তুচিহ্ন' নিগূঢ় তাৎপর্য বহন ক'রে আনে, অবচেতন স্মৃতিকে জাগ্রত করে। বিষয়কে ব্যাখ্যা করে। এই ঘটনাগুলো যখনই ঘটে তখনই নাট্যশিল্প সার্থকতা লাভ করে।

আলোকিত সত্তা

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের রাণী সুদর্শনা যখন মঞ্চে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ব'লে ওঠে, "আলো, আলো কই। এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না।" —কিংবা সফোক্লেসের রাজা অয়দিপাউস নাটকের চরম মুহূর্তে যখন চীৎকার ক'রে ওঠে, "সত্য কী তা আমি জানবই,—আলো, আলো চাই আমার।" তখন বাংলা মঞ্চের দুই মহৎ শিল্পীর কণ্ঠে যে-আকাঙ্ক্ষা, যে-আর্তি ফুটে ওঠে, তা অনায়াসে সঞ্চারিত হয়ে ওঠে অন্ধকার প্রেক্ষায় আসীন হাজার মানুষের মধ্যে। শিল্পীর সেই অনুপম অভিনয় মুহূর্ত গ'ড়ে ওঠে তাঁদের স্বমহিমায় তো বটেই—সেই সঙ্গে সে-ক্ষণটি তৈরি করতে সাহায্য করে নিস্তব্ধ হাজার মানুষও। শুধু কি তাই, সেই শব্দ ও কাব্যের মহিমা প্রকাশে সাহায্য করে পরিচালক, মঞ্চরূপকার, আলোকশিল্পী, নেপথ্যকর্মী সকলে। তাই একটি নাটকীয় মুহূর্তের প্রতিক্রিয়া নৈতিক, রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক, আবেগাপ্লুত, সহজাত, চিরায়ত, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত। সংক্ষেপে বলা ভাল একটি থিয়েটারি মুহূর্ত বড়ই জটিল কার্যকলাপের ফল, এবং যে কেউ বিচার বিশ্লেষণ করতে চাইবেন —একটি নাটকের মুহূর্তরূপ প্রকাশের—তাঁকে কঠিন পরিশ্রম স্বীকার করতে হবে।

অভিনয়শিল্পীর বাঞ্ছিত শক্তি কী? উত্তরে বলা হয়, সে নিজেকে গোপন করবে না—নিজেকে মুক্ত ক'রে প্রকাশ করবে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের চলার পথে যা-কিছু প্রকাশ করতে আমরা কুণ্ঠিত হই — অভিনেতা অনায়াসে ওই পাদপ্রদীপের প্রভামণ্ডলের মধ্যে তা প্রকাশ করতে পারেন। যা আমরা ব্যক্তিগত জীবনে করতে লজ্জা পাই—অভিনেতা সেটা জোরের সঙ্গেই প্রকাশ করেন। প্রথম প্রেমের প্রকাশটা আমরা সংগোপনে করতে চাই খানিকটা আড়ালে। কিন্তু মঞ্চে তার প্রকাশ ঘটে আলোতে। আমার জিঘাংসার প্রবৃত্তি প্রকাশে নিজেই কাঁপতে উঠি—কিন্তু মঞ্চে কোন চরিত্র অনায়াসে তা প্রকাশ করেন। হাতে পিস্তল বা ছোরা ধরতে একটা উল্লাস অনুভব করেন অভিনেতা। মৃত্যু আমাদের কাছে মোটেই সুখকর নয়—কিন্তু কোন নাটকের মৃত্যুদৃশ্যে

অভিনেতা সেই মৃত্যুর মুহূর্তটিকে কতই না যত্নের সঙ্গে অভিনয় করেন,—জীবনের অন্তিম ক্ষণের কষ্ট, দুঃখ সবটাই তিনি দেখাতে চান। আসলে হাজার মানুষের দৃষ্টি যখন তাঁর ওপর নিবদ্ধ তখনই যে অভিনেতার জীবনের শুরু—আর সে-জীবনের সমাপ্তি উইং-এর পাশ দিয়ে ভেতরে চ'লে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই। তাই অভিনয় শেষে দর্শকের প্রশংসা বা সম্বর্ধনা তাকে উৎফুল্ল করে না—। প্রাচীন-কালে কে একজন বলেছিলেন, 'এদের মুখোশটা খুলে নাও—পোষকটা খুলে দাও—দেখবে এরা বড়ই বিব্রত, বড় অসহায়।' — বস্তুত এই হল অভিনেতার ভাগ্য। নিজের মধ্যে যখন মানুষটা ফিরে আসে তখন সে কিছু নয়—কেউ নয়। কিন্তু যখনই সে চরিত্র হয়ে ওঠে—তখন সে একটা কেউ—তখন তার দাম বেড়ে যায়। এই যে নিজের জীবন থেকে অভিনেতার জীবনে উত্তরণ ঘটে সেটা কী কেবল সাজপোষাকে কেবল রঙ মাখায়, কেবল লাইনগুলো মুখস্ত বলায় - তা তো নয়। নাটকের সংলাপ এবং ঘটনা বা নাট্যক্রিয়া যে-চিন্তার ফলশ্রুতি—সেই চিন্তার টুকরোগুলোকে সে গুছিয়ে নিয়ে মালা গাঁথে। কাজটা সহজ নয়। সে তখন কেবলমাত্র ব্যাখ্যাকার নয়, একটা ভাবের বাহন নয়—যে-ভাব অন্যের সৃষ্টি, সে নিজেই হতে পারে একজন স্রষ্টা—ফুল বিছানো পথে অবশ্যই নয়। কুশলী যন্ত্রবিদের মতো সে নাট্যকারের শব্দ—নির্দেশকের ইঙ্গিত এই দুটোকে তার নিজের মধ্যে যা-কিছু আছে তা দিয়ে একটা অখণ্ডরূপ গ'ড়ে তোলে—সেটা সে প্রকাশ করে তার কণ্ঠ দিয়ে, দেহ দিয়ে, ভাব দিয়ে। একটা সামান্য শব্দই তখন গভীর অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার কাজ তখন আবেগ আর মনকে বিচ্ছিন্ন করা এবং সঙ্গে-সঙ্গে আবার ও-দুটোকে যথাযথরূপ যুক্ত ক'রে প্রকাশ করা।

সে আলো চায়—আলো খোঁজে, আমাদের আলোকিত করবার জন্যে। আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন অন্ধকার না-ক'রে—এক ঝলক বিদ্যুৎপ্রবাহে রাতের বুকে কী আছে তা দেখিয়ে দেওয়ার মতো কাজ করে। আমাদের জন্যে সে জঘন্যতম পাপের ছবি আঁকে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করার মানসে। আমা-দের চিন্তাকে সে নিজের দেহে ধারণ ক'রে নিয়ে যবনিকা পতনের পর যেমনটি ছিল তেমনটি ক'রে আবার ফিরিয়ে দেয়।

আমাদের জীবন আমাদের শিক্ষা দেয়—অন্তত এইকথা আমরা শুনে এসেছি চিরকাল। কিন্তু ক'জন মানুষ নিজের জীবন থেকে সমস্ত শিক্ষা আহরণ করতে পেরেছেন?—সংখ্যায় খুবই কম। আমরা বড়জোর আমাদের জীবন থেকে

হতাশার ক্ষুদ্রতার স্বার্থপরতার শিক্ষা পাই। তাই যাঁরা নিজের জীবনকে মুক্ত ক'রে মঞ্চে একটা আদর্শ, একটা ভাবনা, একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেন তাঁরা আমাদের কাছে অনেক দামী। তাই রানী স্বদর্শনার আলোর আকাঙ্ক্ষা এবং দুরূহ পথে সে-আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা আমাদের আশান্বিত করে – বাস্তবকে বুঝতে সাহায্য করে, তাই রাজা অয়দিপাউসের সত্যকে জানার আর্তি আমাদের এক সমাসন্ন ভয়ঙ্কর অন্ধকারের সামনে এনে ফেলেও বাস্তব সত্যকে জানবার এবং স্বীকার ক'রে নেবার সাহস এনে দেয়।

কেমন ক'রে এই কঠিন কাজ অভিনেতা করে? তার কাজ, – বলা হয় – 'কমিউনিকেট্' করা। প্রকাশ এবং তা সঞ্চারিত করতে পারাই এই 'কমিউনিকেশন'। সম্পূর্ণভাবে এই শব্দটার সঠিক বিশ্লেষণ সহজ নয়। কিন্তু যদি সে-কাজটা করতেই হয় – তা হলে বলা ভাল – উচ্চারিত শব্দগুলোর মধ্যে নিহিত সত্যকে আবিষ্কার করা এবং সেই আবিষ্কৃত সত্যকে দর্শকমনে সঞ্চারিত করা। অর্থাৎ কাজটা দাঁড়াচ্ছে অভিনেতাকে 'সত্য' হয়ে উঠতে হবে এবং সেই সঙ্গে জানাতে হবে 'সত্য'টা কী। এই সত্য আবিষ্কার এবং সত্যকে সঞ্চারিত করার কাজটা দ্বান্দ্বিক। দুটো কাজ বিচ্ছিন্ন নয়, হাতে হাত মিলিয়েই করতে হয়। শেষ পর্যন্ত অভিনয় কার্যটা হয়ে ওঠে একজন দাতার। অর্থাৎ অভিনয়টা দেওয়ার কাজ। সে দিতে চায়।

ছেলেবেলায় বাড়ির সামনে আমবাগানে দেখতাম – রাত্রে নিশাচর পাখির হাত থেকে পাকা আমগুলিকে বাঁচাবার জন্যে পাহারাদার গাছের আড়ালে মাচার ওপর গাছে ঝোলানো কেরোসিন টিনে ঘণ্টা বেঁধে মাঝে-মাঝেই শব্দ করছে; পাখিগুলো পালাচ্ছে। অভিনেতার কাজ ঠিক এর উলটো, সে দূরে সরিয়ে দেয় না, তাড়িয়ে দেয় না – আকর্ষণ করে। কাছে টানে। সে অন্ধকারে আড়ালে ব'সে থাকে না – সে আলোর বৃত্তে প্রকাশমান্।

একজন সম্মোহনকারী তার অনুচরকে ঘুম পাড়ায় একটানা ইচ্ছাকৃত একঘেয়ে শব্দের শরীর তৈরি ক'রে। সে-শব্দের কোন অর্থ নেই – সত্য নেই আলো নেই। শুধু আচ্ছন্ন করবার ক্ষমতা আছে। অভিনেতা তার উচ্চারিত শব্দকে কেবল যে ছন্দে স্বরের পর্দায়, ব্যাপ্তিতে বৈচিত্র্যবান্ ক'রে তোলে তাই নয়, সেই শব্দের মধ্যে সত্যকে আবিষ্কার ক'রে শব্দের আনাচে-কানাচে আলো ফেলে তাকে অর্থহীনতার দায় থেকে মুক্ত করে। তাই অভিনেতারা, ওই রানী স্বদর্শনা এবং রাজা অয়দিপাউসের মতো চিরকাল আলো খুঁজছে, সত্যকে জানতে চেয়েছে।